জীবন-চিত্র

সত্য ঘটনামূলক, প্রত্যেক গৃহস্থের
পাঠ্য ও অতীব শিক্ষাপ্রদ

চিত্রকর

শ্রীবিশ্ববান্ধব উপাধ্যায়

দর্শনী এক টাকা ।

চিত্র-পরিচয়

প্রথম দর্শন

দ্বিতীয় দর্শন

তৃতীয় দর্শন

চতুর্থ দর্শন

পঞ্চম দর্শন

ষষ্ঠ দর্শন

সপ্তম দর্শন

অষ্টম দর্শন

নবম দর্শন

দশম দর্শন

একাদশ দর্শন

দ্বাদশ দর্শন ।

জীবন-চিত্র

সত্য ঘটনামূলক, প্রত্যেক গৃহস্থের
পাঠ্য ও অতীব শিক্ষাপ্রদ

চিত্রকর

শ্রীবিশ্ববান্ধব উপাধ্যায়

দর্শনী এক টাকা।

ঢাকা
২০৫, নবাবপুর রোড্ হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ১৯২৩

প্রিণ্টার
শ্রীগোপালচন্দ্র দে,
হেনা প্রেস, ঢাকা।

আমার

এই চৌষট্টি বৎসরের

দেহখানির প্রতি

চাহিলে যে দেহখানির কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে,

যে দেহখানি

আমার প্রৌঢ়ত্বের প্রথম সোপানে

চিরতরে পঞ্চভূতে মিলিয়া গিয়াছে,

যে দেহখানি হইতে

আমার এই দেহখানি উদ্ভূত হইয়াছে,

সেই দেহধারীকে

আমার এই

'জীবন-চিত্র'

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

অর্পিত হইল

চিত্রকরের কৈফিয়ৎ

ছবি দুইরকমে আঁকা যায়। তুলির সাহায্যে নানা রঙ্গে, আর কলমের সাহায্যে অক্ষরে। তুলির আঁকা ছবি শুধু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির উপভোগের সামগ্রী ; যাহার চক্ষু নাই, সে এই ছবির মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য বুঝিতে অসমর্থ। কিন্তু কলমে আঁকা ছবি চক্ষুষ্মান্ অচক্ষুষ্মান্ দুই-ই উপভোগ করিতে পারে। এই ছবি চক্ষুষ্মান্ অচক্ষুষ্মান্‌কে বুঝাইতে পারে। সুতরাং ছবি আঁকিবার বাসনা তুলির সাহায্যে চরিতার্থ না করিয়া, কলমের সাহায্যে করিলাম।

খারাপ ছবিও ছবি, ভাল ছবিও ছবি। রাফেলের 'ম্যাডোনার' ছবিও ছবি, নিধিরাম আচার্য্যের 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভে'র ছবিও ছবি। আবার কালিদাসের অঙ্কিত 'যক্ষবিরহী'র ছবিও ছবি, আমার এই ছবিও ছবি। এই হিসাবে, আমার ছবিকে 'চিত্র' বলিলাম। পাঠক সাবধান!

তবে, চিত্র অঙ্কনের এ প্রয়াস কেন? কিংবা যদি অঙ্কিত করাই ইচ্ছা, তবে অঙ্কন করিয়া স্নানাগারে রাখাই ত উচিত ছিল। উহা আবার এমন করিয়া ঢাক ঢোল পিটাইয়া বাজারে বাহির করা হইল কেন? হাঁ, হত্যাকারীরও যদি একটা কৈফিয়ৎ থাকে, তবে এ চিত্রকরের একটা থাকিবে না কেন?

এই 'জীবনচিত্র' ই চিত্রকরের কৈফিয়ৎ। এই চিত্র সামান্য হইলেও যদি কাহারো চক্ষে লাগিয়া যায়, তবে চিত্রকরের সমস্ত শ্রম ও ব্যয় সার্থক, নতুবা, অনেকে সখ করিয়া ঘরের পয়সা খরচ করিয়া ছবি আঁকে এবং কেহ আদর না করিলেও ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখে, এই চিত্রকরও তাহার 'জীবনচিত্র' নিজের ঘরেই টাঙ্গাইয়া রাখিবে। বাহিরের লোক না দেখিলেও, তাহার ঘরের লোক ত দেখিবে! সুতরাং, এই ছবি সাধারণে আদৃত হয় ভাল, নচেৎ চিত্রকরের ঘরেই বিরাজিত থাকিবে। ঘরের লোকগুলি দেখিবে, চিত্রের কোন্ স্থানে কে কি ভাবে অবস্থান করিতেছে।

'জীবনচিত্র' আর 'জীবনচরিত' দুইটী পৃথক্ জিনিষ। একটী সহজ দোষগুণসহ অকৃত্রিম ছবি, যেমনটী আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে, তেমনটী; অপরটী দোষবাদে শুধু গুণরাশির সাজানো তোড়া। একটী আটপৌড়ে, অপরটী পোষাকী।

মনুষ্যের জীবনে, আর পশুপক্ষীর জীবনে সমতা ও অসমতা দুইই আছে। আহারনিদ্রাদি কার্য্যগুলি মনুষ্য, পশুপক্ষী সকল জীবেই সমান। মানবের দেহ যেমন জন্ম গ্রহণ করে, কিছুদিন থাকে, পরে নষ্ট হইয়া যায়, অপর

জীবের দেহও তদ্রূপ। সকল জীবের দেহই অনিত্য, ধ্বংসশীল। কিন্তু মনুষ্যজন্ম সুদুর্ল্লভ, বহু জন্মের পরে লাভ হয় এবং এই জন্মে এমন কার্য্য করা যায়, যদ্দ্বারা 'পরম অর্থ' (অর্থাৎ যে অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না) লাভ ঘটে। শাস্ত্র এই কথা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জীবনচিত্রের সপ্তম দর্শন হইতে ইহাই চিত্রিত হইয়াছে।

জীব-সেবা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। এই 'জীব' কে, ইহার স্বরূপ কি, বিরূপ কি?—সুখ বা দুঃখ কাহার? জীবের স্বরূপের কি বিরূপের, সুখ দুঃখ ভোগ করে কে? পাপ করে কে এবং কেন করে? জন্ম এবং মৃত্যু কি? কাহার জন্ম বা মৃত্যু হয় এবং কেন হয়? মৃত্যু বা জন্মের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি? এবং প্রয়োজনই বা কি? জীবের নিত্যদেহ কিপ্রকার এবং ইঁহার নিত্যবাসস্থান কোথায়? জীবের সহিত পরমেশ্বরের কি সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ লাভের উপায় কি এবং সেই উপায় অবলম্বনে জীবের পরিণতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা দ্বারা জীবের সেবা করা শাস্ত্রবিহিত। জীব অনাদিকাল হইতে ত্রিতাপ ভোগ করিতেছে। এই

ত্রিতাপের ক্ষণিক উপশম করা যথার্থ জীবসেবা নহে। এই ত্রিতাপের মূল উৎপাটন করিলে জীবের আর কোন ক্লেশ বা অভাববোধ থাকিবে না। সুতরাং, ত্রিতাপ রাখিয়া জীবসেবা দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গলবিধান করা যায় না। এই নিত্যমঙ্গল বিধানের চেষ্টা এই চিত্রে কিয়ৎ পরিমাণে করা হইয়াছে। এই সেবা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা করা যাইতে পারে। সুতরাং, জীবের সেবার জন্যই এই 'জীবনচিত্র' প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল এবং এই কার্য্যে উক্ত বৃত্তিচতুষ্টয়ের অল্পাধিক সার্থকতা করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

চিত্রকরের জীবনপ্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায়। দীপ কখন নিভিয়া যাইবে, আর জ্বলিবে না, স্থির নাই। চিত্রকর তৈলপূর্ণ প্রদীপ হস্তে 'জীবের' যে ধারণা লইয়া জীবন ভরিয়া যে ভাবে 'জীবসেবা' করিয়াছে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ হস্তে সে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার 'জীবের' ধারণা ভুল, সুতরাং জীবসেবাকার্য্যও ভুলে পরিণত হইয়াছে। এই ভুল শোধন করিবার আর অবকাশ আছে কি না, এক সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন। তাহার অবকাশ না হইলেও যদি এই প্রদীপের সাহায্যে তৈলপূর্ণ প্রদীপগুলি যথাস্থানে আলোক প্রদানপূর্ব্বক সৎ-মার্গগামী জীবের সেবায় আত্ম-

বিনিয়োগ করে এবং অসৎ-মার্গগামীদের সেবাজনিত ভুলের অনুতাপে চিত্রকরের ন্যায় দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই চিত্রকরের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

এই 'জীবনচিত্র' দর্শন করিয়া বহু দ্রষ্টার উপলব্ধি হইবে, তাহার ঘরেও ঠিক এমন একখানি চিত্র অঙ্কিত আছে কিংবা অঙ্কিত হইতেছে। সুতরাং যাঁহাদিগের চিত্র এই চিত্রের ন্যায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা এই চিত্র দর্শনে একটু আশ্বস্ত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন, আর যাঁহাদের চিত্রাঙ্কণকার্য্য চলিতেছে, এক্ষণেও অল্লাধিক বাকী, তাঁহারা অঙ্কিত অংশ সংশোধনে বা পরিবর্ত্তনে উদ্যত হইবেন এবং নূতন প্রলেপ প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, এইরূপ আশা জীবনচিত্রের চিত্রকর কিছু কিছু হৃদয়ে পোষণ করেন। আশায় ভর করিয়া চিত্রকর বাঁচিয়া আছে এবং এই আশায় তাহার চিত্র জগজ্জনের সম্মুখে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান।

"জীবনচিত্রের" সপ্তম দর্শন হইতে দ্বাদশ দর্শন পর্য্যন্ত যে সকল পরমার্থবিষয়ক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার উপাদান শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ও বিবিধ উপনিষদ্ হইতে গৃহীত। চিত্রকর দর্শককে সেই সকল গ্রন্থ দর্শন করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত অতি বিরাট্ গ্রন্থ। তাঁহার

একাদশ স্কন্ধ দর্শন করিলেই অনেক চিত্র দেখিতে পাইবেন।

চিত্রকর একখানি চিত্রই আঁকে। যখন তাহার বহুল প্রচার ইচ্ছা করে, তখন মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা লইতে হয়। এই চিত্রকরকেও তাহা করিতে হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায়, "জীবনচিত্রে"র কয়েকটী স্থানে প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ৫৬ পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তি, "কন্যাই"র স্থলে "কন্যার কন্যাই", ৫৭ পৃষ্ঠায় ৫, ৬, পংক্তি "তরুবালার" স্থলে "সুরবালা", হইবে। এইরূপ আরও দুই চারিটী প্রমাদ রহিয়াছে। দর্শক তাহা সহজেই ধরিতে পারিবেন।

চিত্র-পরিচয়

প্রথম দর্শন

দ্বিতীয় দর্শন

তৃতীয় দর্শন

চতুর্থ দর্শন

পঞ্চম দর্শন

ষষ্ঠ দর্শন

সপ্তম দর্শন

অষ্টম দর্শন

নবম দর্শন

দশম দর্শন

একাদশ দর্শন

দ্বাদশ দর্শন ।

জীবন-চিত্র

প্রথম দর্শন

চাঁদে চাঁদে

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রকৃতি রাণী তাহার কর্ম্মশালায় একটী বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত। আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলগুলিকে পাকাইয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য নরম গরম সুর ধরিয়াছেন। এই ঝাঁ ঝাঁ রোদ, আবার আকাশভাঙ্গা জলে সব থই থই করিতেছে। একদিন ফলগুলিকে কড়া রোদে তাঁতিয়া তুলিল, আবার পর দিন জলের ধারা দিয়া শীতল করিল। এইরকম ঠাণ্ডা ও গরম, রোদ ও বৃষ্টিতে কি শুধু আম জাম পাকে, না, মানুষগুলিও পাকিয়া উঠে? এই মানুষ পাকার ব্যাপারটা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

জীবন-চিত্র

টাঙ্গাইলের নাঙ্গিলা নদী ধীরে ধীরে চেহারা বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার শীতে জর্জ্জরিত দেহখানি বসন্তের সমাগমে একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষীণ দেহে আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া ভিখারীর ন্যায় দিনপাত করিতেছিল। অবশেষে জলদেবতা সকরুণ হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার সেই ক্ষীণ দেহখানি দিন দিন স্থূল হইতে লাগিল। আজ সেই দেহের এক নবীন ছবি।

সহদেবপুর গ্রামখানিকে উত্তর কূলে রাখিয়া নাঙ্গিলা পূর্ব্বপশ্চিমে দেহখানি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। মলয়ানিল নাঙ্গিলার জলকণাগুলি তুলিয়া লইয়া সহদেবপুরবাসীদিগের গ্রীষ্মপীড়িত দেহে ছড়াইয়া দিতেছে। সুতরাং, এই নিদারুণ গ্রীষ্মেও তাহারা বৃক্ষতলে বসিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। দাসদের বাড়ীর সেই পুরাতন আম্রবৃক্ষের তলায় বসিয়া গ্রামের পাঁচ সাত জন লোক গ্রাম্যকথায় দিন কাটাইতেছিলেন। সম্মুখে কতকগুলি পাকা আম। স্বর্গীয় গঙ্গাগোবিন্দদাস মহাশয়ের স্নেহশীলা বৃদ্ধা পত্নী ঐ আমগুলি একটী একটী করিয়া কাটিয়া দিতেছেন, আর সন্তানতুল্য গ্রামবাসিগণ তাহা মনের আনন্দে খাইতেছেন। এমন সময়ে বাড়ীর

ভিতর হুলুধ্বনি হইল। হুলুধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন এবং কাণ পাতিয়া হুলুধ্বনি শুনিতে লাগিলেন, হাতের আধকাটা আমটি হাতেই রহিয়া গেল।

এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ বার ধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধা ভাবিলেন, ওঃ, তবে চন্দ্রকমলের ছেলে হইয়াছে। বউমাকে প্রসবব্যথায় একটু একটু উঃ আঃ করিতে শুনিয়াছিলাম। এত শীঘ্রই হইয়া গেল! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা সেই কাটা আমটী হাতে করিয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেলেন। দেখিলেন, সত্য সত্যই চন্দ্রের একটী ছেলে হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে গ্রামশুদ্ধ লোক আসিয়া দাসদের বাড়ীতে জড় হইল। দলে দলে কুললক্ষ্মীগণ নবজাত শিশুকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। এই ভাবে যে বেলাটুকু ছিল, তাহা শেষ হইল। পশ্চিম গগন তাহায় গায়ের সিন্দুরগুলি মুছিয়া ফেলিতে না ফেলিতে, পূর্ব্বগগন গায়ে শুভ্র জ্যোৎস্না মাখিয়া পূর্ণচন্দ্রকে সহদেবপুরবাসীদিগের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। সেই প্রাচীন আম্রবৃক্ষটীর পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া পূর্ণচন্দ্র আতুরঘরের বেড়ার ছিদ্র দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া মাতার কোলে নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের সহিত খেলা করিতে লাগিল।

সৌদামিনী

১৮৫৮ সনের যে ২১শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা আজ সাত বৎসর দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। এই সাত বৎসরে পৃথিবীতে কত কি ঘটিয়াছে—কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে আমাদের পূর্ণও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মায়ের কোল—ঠাকুরমার কোল এখন আর পূর্ণের তেমন ভাল লাগে না। রাত্রে শুইবার কালে এবং দিনে খাইবার কালে তাহার দেখা পাওয়া যায়। বাকী সময় বালকোচিত চাপল্যে কাটিয়া যায়। পূর্ণচন্দ্রের বৃত্তিটা একটু অদ্ভুত রকমের। ছেলেপেলে মাটীতেই খেলা করে, মাটীর ধূলাই গায় মাখে। কিন্তু 'পুনু' বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে থাকিতেই ভালবাসে। এই পুনু সুপারি গাছে, ঐ পুনু জাম গাছে। পুনুর গাছে থাকার বৃত্তিটা বড়ই প্রবল। ইহা দেখিয়া অনেকে পুনুর পূর্ব্বজন্মের কথা বলিয়া ঠাট্টা করিতেন।

এমন করিয়া বাল্যকালের আনন্দে আরও চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এক্ষণে পূর্ণচন্দ্রের বয়স এগার বৎসর। এদিকে লেখাপড়ায় পূর্ণের বেশ স্ফূর্ত্তি। একদিন গ্রীষ্মের ছুটীতে সে আমবাগানে আম খাইতেছে। সেখানে একটী

খুব মোটা আম গাছ ছিল, চারি পাঁচজন লোকেও উহা বেড় পাইত না। এজন্য ঐ গাছটায় উঠা খুব কষ্টকর ছিল। কিন্তু পূর্ণ ভাবিল, সব গাছে উঠি, এই 'খরো' গাছটীতে উঠিতে না পারিলে জীবন বৃথা। এই ভাবিয়া সে একটী মইয়ের সাহায্যে অনেক কষ্টে ঐ গাছে উঠিয়া অবলীলাক্রমে শাখা হইতে শাখান্তরে যাইয়া মনের সাধে আম খাইতে লাগিল। এমন সময়ে তথাকার রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাত বছরের সুন্দরী মেয়েটী আম কুড়াইতে আসিয়া দেখিল, পূর্ণ গাছের উপরে।

পূর্ণ গাছের পাতার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আম্র ভক্ষণে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ সে পায়ের মলের শব্দ শুনিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল সৌদামিনী। সৌদামিনীকে দেখিয়া সে কয়েকটী আম ফেলিয়া দিল। খুকী তাহা কুড়াইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

স্রোতের ফুল যেমন স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে এ ঘাট ও ঘাট ভাসিয়া বেড়ায়; মানুষগুলিও তেমনি কালস্রোতে ও ঘটনাস্রোতে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই স্রোতে পড়িয়া পূর্ণ আজ সহদেবপুর ছাড়িয়া বগুড়ায়। এখানে পূর্ণের একজন স্নেহশীল গৃহশিক্ষক ছিলেন; তাঁহার নাম শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মজুমদার।

সর্পদংশন

এক দিন মজুমদার মহাশয় পূর্ণকে পড়ার ঘরে না দেখিয়া ভাবিলেন, ছেলেটা এখনও বাগানে আছে ; না গেলে আসিবে না। এই বলিয়া তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া পূর্ণকে একটী আম্রবৃক্ষের পাতার আড়ালে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন "পূর্ণ, বাছা ধন, নেমে আয়, আর কত কাল গাছে থাকিবি, আয়, বাছা ধন, আয়।" মজুমদার মহাশয়ের স্নেহভরা ডাক পূর্ণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাছ হইতে টুপ্ করিয়া পড়িয়া অমনি লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া পলাইল। সম্মুখে করতোয়া নদী, ভ্রূক্ষেপ নাই, পূর্ণ জলে ঝাপাইয়া পড়িল—উদ্দেশ্য নদী পার হইয়া শিক্ষককে ফাঁকি দিবে। কিন্তু দূরে যাইতে না যাইতে, এক ঢোঁরাসাপ তাহাকে দংশন করিল। পূর্ণ জলে ঢলিয়া পড়িল। মজুমদার মহাশয় পিছনে পিছনে দৌড়িয়া আসিয়া পূর্ণের বিকলাঙ্গ কাঁধে তুলিয়া মজুমদারদের বাড়ী লইয়া আসিলেন। পূর্ণকে সাপে কামড়াইয়াছে, এই কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, বন্ধুবান্ধব, চিকিৎসক ও সঙ্গে কয়েকজন ওঝা আসিলেন। সাপঝাড়া মন্ত্রে বিষ শীঘ্রই নামিয়া গেল, তখন পূর্ণ সুস্থ হইল।

কথার কথা—পূর্ণের পূর্ণত্ব

পূর্ণের এই ফাঁড়াতে গঙ্গাগোবিন্দ দাস মহাশয়ের সেই বৃদ্ধা পত্নী পৌত্রকে বিবাহিত দেখিয়া যান—এই তাঁহার ইচ্ছা হইল। বয়স অনেক হইয়াছে, যমরাজ কবে আসিয়া উপস্থিত হন ঠিক নাই—সুতরাং শেষ বয়সের একমাত্র বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য পূর্ণকে অপূর্ণ মনে করিয়া আর একটী দেহের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় এক দিন তাহাকে বলিলেন "পুনু, ছ্যাখ, আমি কবে চোখ বুজিব,স্থির নাই, আমি তোর বিবাহটা দেখিয়া যাই। মালতী নগরের মজুমদার বাড়ীর 'শিবু ঠাকুরাণী'কে বিবাহ করিবি ? ওর রংটা কাল বটে, কিন্তু ওর বাপের অনেক পয়সা, ঘর বাড়ী বেশ ভাল। সব সম্পত্তি তুই-ই পাইবি। মেয়েটী কাল হইলেও লাবণ্য আছে।"

এগার বৎসরের পূর্ণ ওসব কথা ভাল বুঝিল না বটে ; কিন্তু উত্তরে বলিয়া ফেলিল "আমি কালো মেয়ে বিবাহ করিব না। টাকা দিয়া আমি কি করিব ? যদি রাম সেনের মেয়ে সৌদামিনীর সঙ্গে বিবাহ দাও, তবে বিবাহ করিতে পারি।" এই বলিয়া সে ঝাঁ করিয়া বাগানে চলিয়া গেল। বালকের চিত্ত ; সব কথা ভুলিয়া গেল।

কথার উপরে একটা কথা বলিয়াছে বই ত নয়। বিবাহের কথা তাহার চিত্তে একটুও স্থান পাইল না।

কিন্তু সেই বৃদ্ধা ভাবিল, পুনু, তা হলে, শিবুকে কাল বলিয়া বিবাহ করিবে না। আচ্ছা, সে ত রামসেনের মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। সুতরাং, আজই প্রস্তাব করিব। যেই কথা, সেই কাজ। দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল। পূজা শেষ হওয়ার পরই বিবাহের উদ্যোগ হইল।

রামচন্দ্র সেনের নিবাস সহদেবপুর। তখনই টেকীতে সংবাদ গেল। সহদেবপুরের দাসদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার বানিয়াবহ গ্রামে। গঙ্গাগোবিন্দ দাসের পিতা রামগঙ্গা দাস মহাশয় বানিয়াবহে বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ "নয় দাস" ছিল বলিয়া তাঁহাদের সম্মানও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং রামচন্দ্র সেন কন্যার বয়স মাত্র সাত বৎসর হইলেও এবং নিজের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইলেও বিবাহে সম্মতি দিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে ধূমধামের সহিত অপূর্ণ 'পূর্ণ' পূর্ণ হইল। তাহার বয়স তখন তের।

যে বিবাহের অপর নাম 'দিল্লীকা লাড্ডু'—যে লাড্ডুর নিমিত্ত মানুষ এত ব্যস্ত—সে লাড্ডু পূর্ণ কেমন করিয়া গলাধঃকরণ করিল, তাহা সে তখন কিছুই বুঝিতে পারিল

না। সুতরাং সে লক্ষ্মীছেলেটীর মত পড়াশুনা করিতে লাগিল। এদিকে সৌদামিনীও বুঝিল না বিবাহটা কি ব্যাপার। বিবাহের কয়েকটা দিন, যখন তাহাকে ঘোমটা টানিয়া থাকিতে হইত, সভ্যভব্যের ন্যায় আস্তেধীরে চলা-ফেরা করা ও কথাবার্ত্তা বলিতে হইত, কেউ দেখিতে আসিলে চোখ বুজিয়া থাকিতে হইত—সে কি কষ্টে কাটাইল, তাহা সে ছাড়া আর কে বুঝিবে? যিনি ভুক্তভোগী তিনি ছাড়া আর কেহ এ কপটতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না। বিবাহের কয়েকটা দিন কাটাইয়া যখন সে বাপের বাড়ীর হাওয়া গায় লাগাইল, তখনই আবার তাহার বালিকাসুলভ চপলতা ও সরলতা দেখা দিল। কোথায় গেল ঘোমটা—আর কোথায় রইল সেই বধূত্ব! বাড়ী আসিয়াই সেই পুতুলের ঝাঁপিটী খুলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "আহা, খুকুন আমার কয় দিন কিছুই খায় নাই, বিড়ালটী এক ফোঁটা দুধও পায় নাই। খুকুমণির বিছানা রোদে দেওয়া হয় নাই।" এই বলিয়া সব ওলট পালট করিয়া গুছাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পূর্ণ-অঙ্গের একাঙ্গ লেখাপড়ায়, অপরাঙ্গ খেলার রঙ্গে মাতিল।

গেছো ছেলের প্রতিভা

দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। "চন্দ্রকমলের বাড়ীতে এত ধূম কিসের গো?" পথে লোকে এই কথা বলাবলি করিতেছিল, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "জান না চন্দ্রের বড় ছেলে পূর্ণ দশটাকা বৃত্তি লইয়া এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। এই গাছ-বাওয়া ছেলেটা এমন ভাল হইবে কে জানিত? শুধু তাহাই নয়, ছেলেটা ইঁচরে পাকিয়াছে—তের বৎসরে বিবাহ করিয়া বসিয়াছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম, ছেলেটা গোল্লায় গিয়াছে; কিন্তু এখন দেখি অন্যরূপ। বেশ বেশ, চন্দ্রকমলের ও রামসেনের কপাল ভাল।"

পূর্ণের বয়স এখন উনিশ। তাহার বাল্যের চাপল্যের স্থান যৌবনের বিনয় অধিকার করিয়াছে। অনেক ছেলে যেমন একটী পরীক্ষা পাশ দিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে, পূর্ণ তেমন নয়। ফলভরে নত বৃক্ষের ন্যায় পূর্ণ বিনয়ে নত হইয়া পড়িয়াছে। সে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে যখন ভর্ত্তি হইবার সময় হইল, তখন সে কৃষ্ণনগর-কলেজে যাইয়া এফ্, এ, পড়িতে লাগিল।

যৌবন কাল। তাহার উপর সহস্র আশা। বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্য যৌবন পায়; আবার জীবনের ভাঁটা আরম্ভ হয়। সুতরাং যৌবনের ন্যায় কাল আর মনুষ্যের জীবনে ঘটে না। এই যৌবন-কালে কত আশার সঞ্চার হয়।

বিবাহ, বড় চাকরি, অর্থোপার্জ্জন, যশঃ, ইত্যাদির কত ছবিই না হৃদয়াকাশে উদিত হইতে থাকে! পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়াকাশে এমন কত শত ছবি আসিয়া উঁকি ঝুকি মারিতেছিল। এমন সময়ে পিতার পীড়ার সংবাদ ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা সেই ছবিগুলিকে মুছিয়া ফেলিল। সে কয়েক মাস পড়াশুনা করিয়া পিতার নিকটে বগুড়ায় চলিয়া আসিয়া চাকরি গ্রহণ করিল। পিতার শেষকাল ও অর্থের অসদ্ভাব এই দুই কারণে সে সামান্য বেতনে চাকরি লইয়া কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল। নিজ হাতে কাপড় কাচা, জ্বালানি কাষ্ঠ চিরিয়া লওয়া প্রভৃতি কাজ তাহাকে নিজ হাতে করিতে হইত। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে বিষাদ বা বিদ্রোহের ভাব উদিত হয় নাই। বরং কি করিলে পিতা জীবনের শেষ দিন কয়টি নিশ্চিন্ত মনে কাটাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে সে স্বীয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পিতৃসেবায় আত্মবিনিয়োগ করিল।

কর্ম্মক্ষেত্রে

প্রতিভার আদর সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্রের অধ্যবসায়, কার্য্যকুশলতা, প্রভৃতি গুণে সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ফলে তাহার কার্য্যক্ষেত্রে সুযশঃ হইয়া উঠিল এবং বেতনও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু এই যশঃ ও বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না পড়িয়া কনিষ্ঠ ভাই তিনটীর প্রতি তাহার স্নেহ ও দায়িত্ব জন্মিল। দ্বিতীয় ভ্রাতা ললিতচন্দ্র স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গ—শশক-ওষ্ঠ ; লেখাপড়ায় তাঁহার কোনপ্রকার মনোযোগ ছিল না। তৃতীয় কৈলাসচন্দ্রকে বি, এ পর্য্যন্ত পড়াইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এল্, এম্, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া আনে। চতুর্থ সতীশচন্দ্রকে কিছু ইংরাজী বিদ্যা প্রদান করিল।

কৈলাসচন্দ্র ডাক্তার হইয়া বগুড়ায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। পিতার যে গৃহাদি ছিল, তাঁহাতে সঙ্কুলান হইত না এবং দীর্ঘকাল ব্যবহারে সেগুলি ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। পূর্ণ স্বীয় ব্যয়নির্ব্বাহ, ভ্রাতার পড়ার ব্যয় এবং গৃহাদি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ এই সকল কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিল।

আঁধার ঘরে আলো

লোকে কথায় বলে, "সুখের সংসার"। কখন? এই সুখের সংসারটা কি কখনও দুঃখের হয় না? পূর্ণচন্দ্রের সংসার আজ সুখের! বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী সৌদামিনী আজ পুত্র শ্রীশচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া এবং স্বামীকে নানাভাবে সেবা করিয়া নিজকে ধন্যা মনে করিতেছেন। কিছুদিন পরে একটী কন্যা আসিয়া শ্রীশচন্দ্রের একচেটিয়া স্থান অধিকার করিল। পুত্রকন্যার আগমনে আজ পূর্ণচন্দ্রের সংসার কত সুখের!

কিন্তু বিধাতার বিধান কেমন জানি না। সুখের বাটী মুখে ধরিতে না ধরিতে তাহা কাড়িয়া লইলেন। সামান্য পীড়ার ছলে বিধি মাতার কোল হইতে শিশু কন্যাটীকে তুলিয়া লওয়ায় সেই নিখুঁত সুখের সংসারে দুঃখের প্রথম রেখা পড়িল। এই রেখাগুলির বোধ হয় এমনই স্বভাব, কোথায়ও একটী পড়িলে, অপরটী আসিয়া পড়িতে চাহে। কেননা, ১৮৮৮ সনে যখন পূর্ণচন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে নোয়াখালিতে ছিল, তখন শ্রীশচন্দ্র বগুড়াতে সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহারা হইল। যদিও এগুলি সুখের সংসারে দুঃখই বটে, কিন্তু যুবক পূর্ণচন্দ্রের নিকট তেমন দুঃখজনক

বোধ হইল না। জানি না, মৃত্যুকালে নিকটে থাকিলে কি করিত। বোধ হয়, দূরত্বে দুঃখের বোঝাটা একটু কমাইয়া দেয়। যাক্, পূর্ণ কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সংসারটাকে তেমন দুঃখের স্থান বলিয়া মনে করিল না। তাহার যৌবনের শেষ হইয়া এক্ষণে ত্রিশের ঘর দেখা দিয়াছে। সৌদামিনী চিরকালের তরে বগুড়ার আকাশে মিলিয়া গেল, পূর্ণচন্দ্র নোয়াখালি হইতে এই সংবাদ পাইল।

সৌদামিনী সৌদামিনীর ন্যায় চলিয়া গেলেন। রহিয়া গেল শুধু অন্ধকার। উপার্জ্জনকারী যুবকপুত্রের গৃহ এমন আঁধার থাকিবে, পিতা ইহা সহিবেন কেমন করিয়া ? তিনি আবার আঁধার গৃহে আলো জ্বালিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অপর দিকে বলধারার শ্রীযুক্ত দিগম্বর সেন মহাশয়ও নিজ কন্যাটীকে পূর্ণচন্দ্রের গৃহপ্রদীপরূপে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিবাহের সব আয়োজন ঠিক, এমন সময়ে পিতা পুত্রকে জানাইলেন, তিনি মাণিকগঞ্জের নালি গ্রামের—'বৈদ্যবল্লভ'বংশসম্ভূত তারক সেনের মেয়ে প্রমোদিনীর সহিত তাহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। যদিও পিতার প্রস্তাবিত স্থানে পূর্ণচন্দ্রের কোন সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই, এবং যদিও পূর্ণচন্দ্র স্বয়ং অপর

স্থানে বাগ্‌দান করিয়াছেন, তবুও পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। তারক সেনের মেয়ের সহিতই পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ কার্য্য হইয়া গেল। আঁধার ঘরে আবার আলো জ্বলিল!

জুড়াই কোথায় ?

কার্য্যস্রোতে পূর্ণ বিভিন্নস্থানে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সৌদামিনী নিভিয়া যাওয়ার পর যে আলোটী তাহার ঘরে জ্বলিতে লাগিল, তাহার নাম প্রমোদিনী হইলেও তাহাকে সে "পুণ্টী" বলিয়া ডাকিত। পুণ্টী বড় ভাল মেয়ে। স্বামীকে নানাপ্রকার সেবা শুশ্রূষা করিয়া দেখাইলেন, দ্বিতীয় আলো প্রথম আলো অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ক্রমে ক্রমে বঙ্কিম ও সুরথ দুইটী পুত্র যখন শ্রীশচন্দ্রকে 'ডাডা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, তখন কোন সময়ে যে সৌদামিনী পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়াকাশে দেখা দিয়াছিল, একথা পর্য্যন্ত কেহ মনে করিবার সুযোগ পাইল না। আবার যখন 'ডলি' নামে কন্যাটী ফুটিয়া উঠিল, তখন কি পূর্ণ না পুণ্টী ভাবিবার অবসর পাইল যে, কোনও একটী ফুল একদিন ঝরিয়া পড়িবে। এমন করিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

বগুড়াতে ডলির 'ক্রুপ' পীড়া দেখা দিল। তিন বৎসরের ডলি এই ক্রুপের দংশনে ঢলিয়া পড়িল, আর জাগিল না। আবার আলোকময় গৃহে অন্ধকার প্রবেশ

করিল। পুণ্টী ডলিকে হারাইয়া দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল। আস্তে আস্তে পুণ্টীর জীবনপ্রদীপ পর্য্যন্ত নিভিয়া গেল। এবার আর পূর্ণচন্দ্র সামলাইতে পারিল না। ডলিকে হারাইয়া সে মনে করিয়াছিল, গাছটী ত আছে, আরও কত ডলি ফুটিবে। কিন্তু এইবার গাছটীকে হারাইয়া সে আর গৃহোদ্যানের দিকে তাকাইতে পারিল না। বিশেষতঃ মাতৃহীন শ্রীশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরথচন্দ্রকে দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এইবার কতকগুলি ভাবের সমাবেশ হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের উদ্দাম যৌবনের ঢল ঢল ভাবতরঙ্গের খেলা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়ত্বের দূত আসিয়া অনেক কথা পূর্ণের কাণে কাণে বলিয়া যাইতেছে। চোখে, মুখে, দেহের নানাস্থানে একটু আধটু করিয়া চিহ্নও বসাইয়া রাখিতেছে। এক্ষণে একে একে কত চিত্র তাহার মানসনেত্রে উদিত হইতে লাগিল। সহদেবপুরের সেই প্রাচীন আম গাছ, সৌদামিনীর আম কুড়ান, বগুড়ার প্রসন্ন মজুমদার, সর্পদংশন ইত্যাদি করিয়া অনেক কথা—তার পর মাতার মৃত্যু, সৌদামিনীর মৃত্যু, কন্যার মৃত্যু, ঠাকুরমার মৃত্যু। এই জাতীয় ভাবনারাশি তাহার

চিত্ত উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। এমন সময়ে তাহার বৃদ্ধ পিতার জীর্ণ প্রাচীন দেহখানি চিরতরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যখন ছোটখাট গাছগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ায় পূর্ণ তাহাদের ছায়া হইতে বঞ্চিত হইত, তখন সে এই প্রাচীন বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় তাপিত প্রাণে শীতলতা সিঞ্চন করিত। হায়! এক্ষণে সেটাও রহিল না। পূর্ণচন্দ্র, তুমি জুড়াইবে কোথায়?

কে বলে সংসার দুঃখের ?

পূর্ণচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, তাই ত সৌদামিনী আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেল ? সুকোমল পুষ্পতুল্য কন্যা দুইটী অকালে শুকাইয়া গেল ! পিতা আমায় স্নেহদানে কুণ্ঠিত হইলেন। পুণ্টীকে কত আদর কত যত্ন করিতাম, সেও তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল ! তবে কি সকলেই এমন করিয়া চলিয়া যাইবে—ঐ যে শ্রীশ, বঙ্কীম, সুরথ, ওরাও কি তবে চলিয়া যাইবে ? আমিও কি তবে চলিয়া যাইব ? তবে কি থাকিতে আসি নাই ? এইরূপ অনেক প্রশ্ন পূর্ণের চিত্ত আলোড়ন করিতে লাগিল। যাহাদিগকে আমরা বান্ধব বা আত্মীয় বলি, তাহারা পূর্ণকে পুনর্ব্বার বিবাহ করাইয়া সংসারের নিত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্য পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবার পরামর্শ ও অনুরোধ দ্বারা বান্ধবতা ও আত্মীয়তার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পূর্ণের সংসারের প্রতি অনিত্যবুদ্ধি ও আত্মীয়বর্গের তাহাতে নিত্যবুদ্ধি—এই দুই বুদ্ধিতে সংগ্রাম চলিল। পূর্ণই জয় লাভ করিল। কিন্তু ক'দিন ? শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত নামে একজন স্কুল-ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টর পূর্ণের হা-হুতাশময় হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ সুশীতল

বারি সিঞ্চন করিতে করিতে তাহাকে বুঝাইলেন যে, পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলে, তাহার সব জ্বালা জুড়াইবে। পূর্ণের বৈরাগ্যে আবার ভোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সম্মত হইল।

সার, কে জি, গুপ্ত মহোদয়ের জন্মভূমি ভাটপাড়া একটী বৈদ্যপ্রধান প্রসিদ্ধ স্থান। তাঁহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম অনেকেই জানেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গবর্ণমেণ্টের উচ্চ চাকুরি করিতেন, এক্ষণে তিনি কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় আছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ডাক্তার সুরেশচন্দ্র গুপ্ত এল্, এম্, এস্ ঢাকায় ডাক্তারি করেন। সরযূ ইঁহাদের কনিষ্ঠা ভাগিনী। ১৮৯৭ সালে নারায়ণগঞ্জে সরযূর সহিত পূর্ণচন্দ্রের হিন্দুমতে বিবাহ হয়।

নবোঢ়া সরযূকে লইয়া পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেল। আলোর প্রবেশে যেমন বহুকালের সঞ্চিত অন্ধকাররাশি এক মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয়, ফুটন্ত দুগ্ধ যেমন শীতল বারিপ্রক্ষেপে শান্ত হয়, তেমনি সরযূর আগমনে পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়ের তমসাচ্ছন্ন কক্ষগুলি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার ক্ষতগুলি সব শুকাইয়া গেল। পূর্ণ আবার ভাবিল "কে বলে সংসার দুঃখের ?"

দ্বিতীয় দর্শন

'মাখন'

পিতার স্নেহময় হস্ত দুইখানি পূর্ণের শিরোদেশ হইতে অপসারিত হইতে না হইতে, সরযূর নবীন প্রীতির প্রগাঢ় অঞ্চল তাহাকে সকল তাপ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। সরযূর কোমল স্বভাব, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও সেবার পরাকাষ্ঠায় তাহার 'মাখন' নাম সার্থক হইল। তাহার মাতাপিতাও তাহার স্বভাবের কমনীয়তা দেখিয়া বাল্যকালেই তাহাকে এই নামে ডাকিতেন। মাখন মাথায় দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, গায়ে মাখিলে চামড়া চাক্‌চিক্য-বিশিষ্ট হয়, ভক্ষণে দেহ পুষ্ট হয়, কিন্তু মাখনের অত গুণ থাকা সত্ত্বেও, উহার একটী বড় দোষ, উহা পিচ্ছিল। পূর্ণ কি এই সব দোষ গুণ বিচার করিয়া সরযূকে সরযূ না বলিয়া 'মাখন' বলিয়া ডাকিত!

সরযূকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণ সাত বৎসর কাল নানা জায়গায় ঘুরিয়া ফরিদপুরে আসিয়া চাকরিতে যোগ দিল। মাখনের গর্ভে সন্তান হইলেও, সে সৌদামিনীর গর্ভজাত পুত্র শ্রীশচন্দ্র ও প্রমোদিনীর গর্ভজাত বঙ্কিম ও সুরথকে নিজের সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিল।

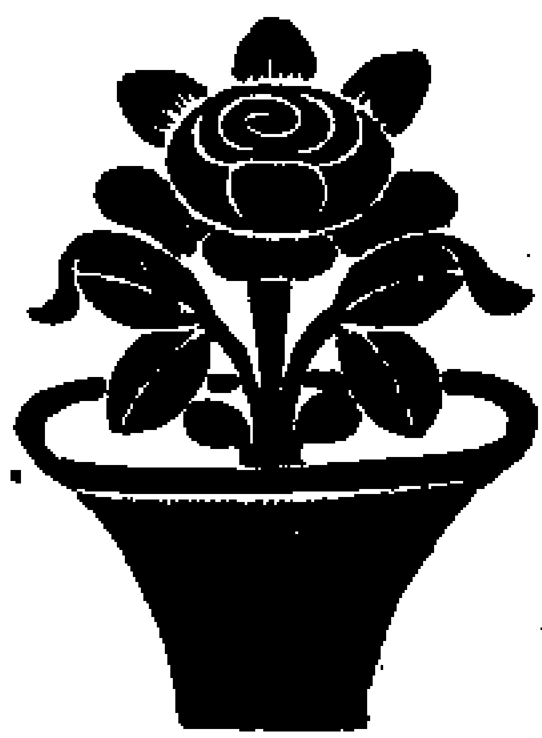
খাল কাটিয়া কুমীর আনা

এক দিন কিরণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে ফরিদপুরের এক ভদ্রসন্তান একটী বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া পূর্ণচন্দ্রের বাসা-বাড়ীতে উপস্থিত। সঙ্গে দশ বৎসর বয়সের একটী বালক, মলিন বেশ, কিন্তু চেহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। বালকটীকে দেখিয়া পূর্ণ জিজ্ঞাসা করিল "এ কে হে, কিরণ?" কিরণ বলিল, "পূর্ণবাবু এই বালকটীর কথা আমি পূর্ব্বে এক দিন আপনাকে বলিয়াছিলাম। আপনি ইহাকে আনিতে বলিয়াছিলেন, তাই লইয়া আসিয়াছি। এ ছেলেটীর কেহ নাই—অনাথ। কিন্তু পড়াশুনায় বড় ভাল এবং স্বভাব চরিত্র অতি সুন্দর। জাতিতে কায়স্থ, নাম কলীন্দ্রনাথ দে। আপনি আপনার ছেলেদের সহিত ইহাকে যদি একটু স্থান দেন, তবে ছেলেটী মানুষ হইতে পারে। আপনি ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। বিশেষতঃ পরোপকারকার্য্যে আপনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। এই ভরসায় আমি আপনারই কাছে লইয়া আসিয়াছি।"

কিরণের কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের স্বভাবতঃ উদার ও দয়াপ্রবণ হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে একটুও

বিচার না করিয়া বলিল, "বেশ, কলি আমার কাছে থাকিবে, আমি ওকে মানুষ করিব।" এই বলিয়া পূর্ণ ছেলেটীকে লইয়া বাড়ীর ভিতর মাখনের কাছে লইয়া তাহার জিম্মা করিয়া দিল। মাখনও কলিকে পুত্র বলিয়া বরণ করিয়া লইল।

কলি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমবয়স্ক, সাত আট মাসের বড়। কাজেই কলির সহিত শ্রীশ, বঙ্কিম ও সুরথের অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইল। কলির ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। সে যেমন বিনয়ী তেমন শ্রদ্ধাশীল। পূর্ণকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত এবং মাখনকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। এমন করিয়া কলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণের পরিবারভুক্ত হইয়া গেল।



কলির কৃতিত্ব

১৯০৬ সনে যখন ঘোরতর স্বদেশী আন্দোলনে স্কুলের ছেলেরা strike 'ষ্ট্রাইক' করিল, তখন পূর্ণ বদলি হইয়া ঢাকায় আসিয়াছে। ঢাকায় কলেজিয়েট স্কুলে বঙ্কিম, সুরথ ও কলি পড়িত। তাহারাও অন্য বালকের সহিত স্কুল পরিত্যাগ করিল। হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মহাশয়ের অনুরোধে যখন পূর্ণ ছেলে তিনটীকে স্কুলে যাইবার জন্য বুঝাইতে লাগিল, তখন মাখন আসিয়া বলিল, "বঙ্কিম ও সুরথকে তুমি আদেশ করিতে পার; কিন্তু কলি পরের ছেলে, উহার স্বাধীনতার উপর তোমার কোন হাত নাই। সে ইচ্ছা না করিলে, তাহাকে জোর করিয়া স্কুলে পাঠাইও না।" এই কথায় পূর্ণ নিরস্ত হইয়া কলিকে পীড়াপীড়ি করিল না। কলি তখন ন্যাসন্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ছয় মাসের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়। তাহার কলকব্জার কাজ শিখিতে ইচ্ছা হওয়ায় পূর্ণ তাহাকে আহম্মদাবাদে কলের কাজ শিখাইবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। দুই বৎসরের মধ্যে তথাকার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট হইতে একখানি উচ্চ প্রশংসাপত্র লইয়া কলি

ফিরিয়া আসিল। প্রশংসাপত্রে সাহেব লিখিয়াছিলেন "এই বালকের যে প্রকার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, তাহাতে যদি ইউরোপে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তবে কালে সে একজন খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারিবে।"

সাহেবের এই প্রশংসা পাঠ করিয়া পূর্ণ কলিকে আমেরিকায় পাঠায়। পূর্ণ জাহাজ ভাড়া "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" হইতে যোগাড় করিয়া নিজে পোষাকাদিতে এক হাজার ও নগদ তাহার সঙ্গে পাঁচ শত টাকা দিয়া কলিকে রওয়ানা করিয়া দিল। কলি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া জানিল আমেরিকায় পাঠ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এক বৎসর বসিয়া থাকিতে হইবে, সুতরাং সে তথায় না গিয়া এবং ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে দেখিয়া স্কট্‌লণ্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। পূর্ণ তাহাকে চারি বৎসর কাল মাসিক আশি টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। ইহাতে তাহার সমুদয় ব্যয় সঙ্কুলান হইত না বলিয়া, সে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য কাজ করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত।

এইরূপে চারি বৎসরে কলি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় অতিশয় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়, এমন সময়ে (১৯১৪

সনে) জার্ম্মেনির সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে। তখন ইংলণ্ডের ব্রাইটন নামক স্থানে একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ কার্য্যে কলি নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রমশীলতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়ায় তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষ তাহাকে বাঙ্গালা দেশের এক রেলওয়ের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ১৯১৬ সনে কলি বাঙ্গালায় আসিয়া কার্য্যে যোগদান করে।

মিঃ ডে

কালের অতল গর্ভে আটটী বৎসর বিলীন হইয়াছে। সঙ্গে মনুষ্যের ভাগ্যচক্রে কত আবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে ? এই আট বৎসরে অনাথ বালক কলীন্দ্র "মিষ্টার কে, এন্, ডে" হইয়া গিয়াছে। যে বালক এক সময় আটটী পয়সার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ সে আট শত টাকা বেতন ভোগ করিতেছে। হায় বিধির চক্র !

এ দিকে তাহার পালকপিতা পূর্ণচন্দ্র কক্সবাজারে খাস তহশিলদার হইয়াছেন। সুতরাং কলি বিলাত হইতে চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াই তাহার অন্নদাতা, শিক্ষাদাতা পালক পূর্ণচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ ও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার জন্য কক্সবাজারে উপস্থিত হইল। দীর্ঘ আট বৎসর কাল পরে কলীন্দ্রকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত অথচ পূর্ব্ববৎ বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল দেখিয়া পূর্ণচন্দ্রের যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ হইল। এবং দীর্ঘকাল বিদেশীয় ভাব, রুচি, শিক্ষা, আচারব্যবহারের মধ্যে থাকিয়াও তাহার সৌজন্য ও বিনয়ের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই দেখিয়া পূর্ণ তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিল এবং ভগবানের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিল।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়

১৯১৮ সনে পূর্ণচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের অবসান হয়। তখন পূর্ণ ভাবিতে লাগিল, যে কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিব পেন্‌সন দ্বারা কোনপ্রকারে কাটাইয়া যাইব। বার্দ্ধক্যের অনুকূল চিন্তা এক্ষণে পূর্ণের চিত্তে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে।

পূর্ণের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম তটিনী। তটিনী খুব প্রতিভাশালিনী। ঢাকা ইডেন হাই স্কুল হইতে পনর টাকা বৃত্তি লইয়া ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা ডাইওসিসেন কলেজে এফ্, এ, পড়িতে যায়। কুড়ি টাকা বৃত্তি সহ ঐ পরীক্ষা পাশ করিয়া সেই কলেজেই বি, এ পড়িতে থাকে। পূর্ণ, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মেরি ভিক্টোরিয়াকে লিখিলেন, "আমি প্রতি মাসে তটিনীর সমুদয় খরচের টাকা পাঠাইয়া দিব। আপনি তাহার বৃত্তির টাকাগুলি সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিবেন।" এই ভাবে তটিনীর হিসাবে চারি শত আশি টাকা জমা হইয়াছিল।

তটিনী থার্ড-ইয়ার ক্লাসে বেশ মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তাহার

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। দাদাকে হঠাৎ দেখিয়া তটিনী একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, হঠাৎ এলে যে ? আফিসের কাজে এসেছ না কি ? বাড়ীর সকলে ভাল ত ? আমার মনটা—" কথা শেষ করিতে না করিতে ভ্রাতা বলিল, "তটিনী, আমি অফিসের কাজে আসি নাই, মা'র ভারী অসুখ ; তিনি অসুস্থ হইয়া ঢাকায় গিয়াছেন। তাই তোমাকে নিতে আসিয়াছি। আজই তোমাকে লইয়া ঢাকায় যাইব। চল, তোমাদের মেম সাহেবের নিকট যাইয়া তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া আসি।" মাতার পীড়ার কথা শুনিয়া তটিনী অত্যন্ত চিন্তিতা ও বিষণ্ণা হইল এবং তখনই দাদাকে লইয়া মেম সাহেবের নিকট গেল। তিনি তাহার দাদার নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "তটিনীর পিতা পূর্ণবাবুর অনুমতি ব্যতীত আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। সুতরাং আপনি তাঁহার অনুমতি আনুন।"

দাদা বিপদ্ গণিল। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়। একটু ভাবিয়া এক উপায় বাহির করিল। যে কলীন্দ্র দেকে পূর্ণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে এক্ষণে "মিঃ কে, এন্ ডে"—এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, বেঙ্গল রেলওয়ে। তটিনীর দাদা তখন পিতা

পূর্ণচন্দ্রের নিকট অনুমতিসূচক পত্রের জন্য না লিখিয়া, সেই মিঃ ডের নিকট টেলিগ্রামে জানাইল, “তুমি বাবার নামে তটিনীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রিন্সিপ্যাল্ মিস্ মেরী ভিক্টোরিয়ার নিকট একখানা টেলিগ্রাম কর।” মিঃ ডে প্রস্তুতই ছিলেন। অমনি একখানি মিথ্যা টেলিগ্রাম করিলেন। মিস্ ভিক্টোরিয়া টেলিগ্রাম পাইয়া তটিনীকে ছাড়িয়া দিলেন। ভ্রাতা, ভগিনীকে লইয়া ঢাকায় চলিয়া আসিল।

এদিকে মিস্ ভিক্টোরিয়া ভ্রাতার মুখে তটিনীর বিদায়ের প্রস্তাব শুনিয়া কক্সবাজারে পূর্ণচন্দ্রের নিকট সকল কথা জানাইয়া একখানি টেলিগ্রামে তাহার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণ সেই টেলিগ্রামের উত্তর পাঠাইবার পূর্ব্বেই ভ্রাতা বিলাতপ্রত্যাগত উচ্চশিক্ষিত মিঃ ডের মিথ্যা টেলিগ্রামের বলে তটিনীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। মিস্ ভিক্টোরিয়ার টেলিগ্রাম পাইয়া পূর্ণের অনেক অনুমান ও কানাঘুষার কথা মনে পড়িল এবং মিস্ ভিক্টোরিয়াকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল “আমি তটিনীর ভ্রাতাকে তাহাকে আনিবার জন্য পাঠাই নাই। ঘটনা মিথ্যা। আমি এবিষয়ের কিছুই জানি না। ইহার ভিতরে অনেক ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া আমার বোধ হয়। আমি না

আসা পর্য্যন্ত আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন না।" এই টেলিগ্রাম পর দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার হস্তগত হইল। টেলিগ্রাম পাইয়া মিস্ ভিক্টোরিয়া চমকিত হইলেন এবং ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় নাই। বাধ্য হইয়া পূর্ণের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

মেয়ে নয়, পুরুষের বাবা

১৯১৮ সন। চট্টগ্রামে মিঃ ডের বাঙ্গালাতে বসিয়া পূর্ণ মাখনকে বলিতেছে, "ও কে আস্‌ছে ? তোমার মামা প্রতুল, সঙ্গে তাহার 'স্বামী' সুরবালা !" কথাটা শুনিয়া মাখন একটু বিরক্ত হইয়া পূর্ণকে বলিল "তুমি আর ভদ্রতা শিখিবে কবে ? এখনও মান সম্মান রাখিয়া কথা বলিতে শিখিলে না, বয়স ত ষাট হইল !"

স্বামিস্ত্রীর এই কথোপকথন শুনিয়া তৃতীয় ব্যক্তি কি ভাবিবে জানি না। সুরবালা ত প্রতুলের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রতুল চট্টগ্রামের বড় চাকুরে। তবে, সুরবালাকে প্রতুলের স্বামী বলা হইল কেন ? পূর্ণের কি মাথা খারাপ !

না, পূর্ণের মাথা খারাপ নহে। পূর্ণ জানে—পূর্ণ কেন সকলেই জানে—স্বামিস্ত্রীতে একটা মর্য্যাদাসূচক সম্পর্ক আছে, এই মর্য্যাদা উচ্চগামিনী অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীকে মর্য্যাদা করিবে। যেখানে এই স্ত্রীধর্ম্মের বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে লোকে বিদ্রূপ করিয়া কত কথাই না বলিয়া থাকে ! সেই বিদ্রূপের মধ্যে উপরের উক্তিটী একটী। সুরবালা ঠাকুরাণী যে স্বামী প্রতুলচন্দ্রের উপর শুধু কর্ত্তৃত্ব করেন তাহা নহে। তিনি স্ত্রী হইয়াও স্বাধীনা,

নিরীহা লজ্জাশীলা পতিসেবাপরায়ণা স্ত্রীদিগকে তিনি ঘৃণা করেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, সাহেবী ধরণে থাকা, হিন্দুয়ানীকে ঘৃণা করা, গৃহস্থালী না করা—এই সব তাঁহার আদর্শ।

মিঃ ডে জাতিতে কায়স্থ। পূর্ণ জাতিতে বৈদ্য। পূর্ণ ত আর বিলাতফেরৎ নহেন—কিংবা ব্রাহ্ম নহেন যে, মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যা' তা' করিবেন। সুতরাং সে তটিনীকে যদিও বি, এ পড়াইতেছিল, তবুও সে জাতি দিবার জন্য কখনই প্রস্তুত ছিল না। এইজন্য সে মনে করিতেছিল, তটিনীকে বি, এ পাশ করাইয়া একটী ভাল বৈদ্যসন্তানের সহিত বিবাহ দিবে। যখন মিঃ ডে 'কুলীন্দ্র' ছিলেন, তখন তটিনী তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, দাদার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। দুই জনে এক পরিবারে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিল।

সুরবালা ঠাকুরাণী একথা সে কথার পর পূর্ণকে বলিতে লাগিলেন, "তটিনীর বিবাহের কি করিয়াছেন ?" পূর্ণ বলিল, "তটিনীর থার্ড ইয়ার, আরও এক বৎসর পড়িয়া বি, এ পাশ করুক, তবে বিবাহের কথা ভাবিব। এখন কি ?" সুরবালা অনেক ওকালতি ঠিকঠাক করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণের ভাবগতিক বুঝিয়া

কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন না। স্থির করিলেন, সোজা পথে কাজ হইবে না। কৌশলে কাজ সমাধা করিতে না পারিলে, আমার নাম সুরবালা ঠাক্‌রুণ নহে। পূর্ণ বাবু, তোমার বয়স ষাট পার হইয়াছে। তোমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছে। দেখিবে, কাহার কথা ফলে !

সুরবালা ঠাকুরাণী বাহিরে পূর্ণের কথায় "বেশ, বেশ, তাই ত করা উচিত ; লেখাপড়া শিখাইয়া তবে বিবাহ।" এই বলিয়া অনুমোদন দেখাইলেন, কিন্তু ভিতরে উপরোক্ত ভাবগুলি তাহার চিত্তে বিষপ্রক্ষেপ করিতেছিল। মুখে একথা ওকথা বলিয়া কিছুক্ষণ ভদ্রতা দেখাইয়া বিদায় লইলেন।

দশচক্রে ভগবান্ ভূত

পূর্ণের বয়স ষাটের উপর। সুতরাং বয়সের একটা অভিজ্ঞতা ত আছে। তা ছাড়া, পূর্ণের নানা স্থানে ভ্রমণ, নানা লোকের সঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা বুদ্ধির একটা সূক্ষ্ম বিকাশ দেখা যাইত। যখন সুরবালা ঠাকুরাণী পূর্ণের নিকট তটিনীর বিবাহের কথা পাড়িয়া বিনা তর্কে চলিয়া গেলেন, তখনই পূর্ণ বাঙ্গালাতে বসিয়া নানা কথা

ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ সুরবালার 'পত্নী' প্রতুল গুপ্তের সাতপৃষ্ঠাব্যাপী পত্রের কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। উহা ত পত্র নহে—পত্রের অন্তরালে তটিনীর সহিত মিঃ ডের বিবাহের ওকালতি। এক দিন তটিনী ও 'ডে'কে এক সঙ্গে বাগানে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া প্রতুল গুপ্তের মনে যে সব ভাব জাগিয়াছিল, তাহাই তিনি সেই পত্রে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণ তাহা উন্মত্তের প্রলাপ মনে করিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন; কেন না, উভয়ের মধ্যে ভ্রাতাভগিনীর ভাব এবং একটী বৈদ্য অপরটী কায়স্থ। বিশেষতঃ "ডে" পূর্ণের নিকট চিরঋণী। তিনি কখনই পূর্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়া অকৃতজ্ঞতা বা অবাধ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না। 'ডে'র জন্য পূর্ণ কি না করিয়াছে! এই সকল কথা বিশেষভাবে বিচার করিয়া পূর্ণ সেই সাতপৃষ্ঠা-ব্যাপী পত্র ও সুরবালা ঠাকুরাণীর প্রস্তাব একবারে অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু শুনা যায়, "দশচক্রে ভগবান্ ভূত।" পূর্ণ কি তবে পাকচক্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে!

অঙ্গুরী-বিনিময়

চট্টগ্রামের ওভারসিয়ার মিঃ সি, সি, দে। মিঃ ডি, দে তাঁহার ভ্রাতা। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী—কলিকাতায় বাস করেন। 'বুলি' তাঁহার কন্যা, রূপে গুণে অতুলনীয়া। মাতাপিতা সাধ করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন 'বুলি'। বুলি ফুল আমাদের দেশে ফোটে না, বিলাতে ফোটে, ইঁহারা বিলাত-প্রত্যাগত। বিলাতী ধরণে জীবন যাপন করেন। সুতরাং সেই বিলাতী ফুল ভারতবর্ষে ফুটিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? বুলি বিবাহযোগ্যা। মিঃ সি, সি, দে মহোদয়ের পত্নী মিঃ ডেকে কলিকাতায় মিঃ ডি, দে মহোদয়ের বাড়ীতে অতিথিরূপে পাঠাইলেন।

বিলাতে যুবকযুবতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, মেশামিশি করে। নির্জ্জনে ভ্রমণ—নির্জ্জনে উপবেশন—নির্জ্জনে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস উদ্‌গিরণ—ইত্যাদি কার্য্য কিছু দিন স্বচ্ছন্দে চলিতে থাকে। ইহাকে সেই দেশীয় ভাষায় বলে 'কোর্টশিপ্'। এই 'কোর্টশিপ্' ক্রিয়াটী সুন্দররূপে চলিলে তবে পরস্পরে অঙ্গুরী-বিনিময় করিয়া পরিণয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

বুলির সহিত মিঃ ডের কোর্টশিপ শেষ হইল। তখন মিঃ ডে তাঁহার স্বীয় অঙ্গুরী বুলিকে দিয়া বুলির অঙ্গুরী

নিজে পরিধান করিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অঙ্গুরী-বিনিময়ই উদ্বাহবন্ধনের পূর্ব্বাভাষ বা অরুণোদয়। সূর্য্যোদয় হয় হয়। মিঃ ডে ও মিঃ ডি, দের বন্ধুবর্গ সূর্য্যোদয় দর্শনের জন্য পূর্ব্বগগনে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। পালক পিতা পূর্ণচন্দ্র পালিত কলি যোগ্য পাত্রে পরিণীত হইবে জানিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে। সে কলিকে বলিল, "কলি, এমন ঘরে তোমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, বড়ই সুখের কথা, বড় বড় মুরুব্বি, সম্ভ্রান্ত ঘর, মেয়েটীও সুন্দরী ও গুণবতী। এখানে বিবাহ কর। আমি তোমাকে বিবাহের জন্য এক হাজার টাকা সাহায্য করিব।"

দৈবাৎ সূর্য্যদেব সংবাদ পাঠাইলেন, "যাঁহারা তাহার উদয়ের জন্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব আছেন, তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া যাউন। সে আর বুলির হৃদয়গগনে উদিত হইবে না। এই বুলির অঙ্গুরী প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।" দুর ছাই! যদি ফেরৎই দেওয়া চলে, তবে এমন অঙ্গুরী গ্রহণ করে কে? এবং এরূপ অঙ্গুরীপরিবর্ত্তনের সার্থকতাই বা কি? আচ্ছা! মিঃ ডের অঙ্গুলী হইতে এত সাধের অঙ্গুরী খসাইল কে?

সুরবালার জেদ

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। এইবার সুরবালা ঠাকুরাণী জল সহযোগে আদ্রক ভক্ষণ করিয়া এবং মাথার ঘোমটা কোমরে বাঁধিয়া ভ্রাতাকে 'স্বামী' ও বোন্‌কে 'পত্নী' সাজাইবার জন্য আসরে নামিলেন। ভাবিলেন, ভ্রাতাভগিনীর সম্পর্ক নিষ্কাম ও স্নেহময়, এ সম্পর্কে ভাবের উচ্ছ্বাস নাই, চিত্তের উত্তাপ নাই—হা হুতাশ নাই— উন্মত্ততা নাই—হিতাহিতবুদ্ধিহীনতা নাই—অকৃতজ্ঞতা নাই—বিশ্বাস-ঘাতকতা নাই ! এই ভাব দূরীভূত না করিলে বাঙ্গালী 'সভ্য' বলিয়া গণ্য হইবে না। যে সম্বন্ধে পুরুষকে স্ত্রীর দাস, ভগিনীকে ভ্রাতার বিলাসসামগ্রী করা যায় না, তাহা কি সম্পর্ক বলিয়া গণ্য ! পুরুষ ত স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ। মাতা, পিতা, উপকর্ত্তা প্রভৃতি ইঁহারা অন্ধ। বিশেষতঃ পূর্ণবাবুর ত শেষ কাল। তিনি এসব নবীনতার রসাস্বাদনে বঞ্চিত। সুতরাং যদি আমার আচারটী প্রচার করিতে না পারিলাম, তবে আমার জন্মই বৃথা ! পূর্ণ বাবু, তুমি 'মাখনকে' মাখন বলিয়াই জান—কিন্তু মাখন যে পিচ্ছিল, তাহা এইবার টের পাইবে ! তুমি আমাকে 'স্বাধীনচেতা' 'এ ত মেয়ে নয় পুরু-ষের বাবা' বলিয়া বিদ্রূপ কর। দেখিব তোমার বিনীতা আদরের 'তটিনী' ও সোহাগের 'মাখন' 'মেয়ে' কি 'পুরুষ' ?

জিহ্বা ও কান

জিহ্বা ও কানে একটী চমৎকার সম্বন্ধ। জিহ্বা বলে, কান তাহা শুনে। আবার কান যাহা শুনে, জিহ্বা তাহা বলে। দেখা যায়, জিভ্ ও কানে বলা ও শুনার একটা নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নিত্যকালই আছে। এই দুই যন্ত্রের ক্রিয়াশক্তি সাতিশয় প্রবলা ও অতি ভয়ঙ্করা ? যখন ভোগের দিকে ক্রিয়া করে, তখন মনুষ্যকে পশু অপেক্ষাও হীন করিয়া তুলে, আবার যখন ত্যাগের দিকে লইয়া যায়, তখন মনুষ্য দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য হন। কান যখন ভাল কথা শুনে, জিহ্বা তখন ভাল কথা বলে। যে জিহ্বা খারাপ কথা বলে, সে কথায় কান দিলে সেই কান খারাপ হইয়া যায়। ভালকে খারাপ করা যত সহজ, খারাপকে ভাল করা তত কঠিন। মাখন সাবধান, তটিনী সাবধান, শ্রীশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরথচন্দ্র তোমরা সকলে সাবধান ! ঐ তোমাদের কানের কাছে এক ভীষণ জিহ্বা নৃত্য করিতেছে ! সাবধান !!

লজ্জা স্ত্রীজাতির অমূল্য সম্পত্তি। দারুণ অভাবে পড়িলেও তাহারা সমস্ত সম্পদ্ ত্যাগ করে বটে, কিন্তু এই লজ্জাসম্পদ্ কিছুতেই ত্যাগ করে না। হাঁ, অভাবে ত্যাগ করে না বটে, কিন্তু স্বভাবে ত্যাগ করে। যদি

কোন লজ্জাবতী কুললক্ষ্মীর কানের নিকট একটী লজ্জাহীনা নারীর জিহ্বাকে ক্রিয়া করিতে দেওয়া হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই লজ্জাবতীর অবগুণ্ঠন আর নাই, সে কুললক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে কুলটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসতী জিহ্বার এতই প্রভাব! সুতরাং, সেই জিহ্বা যে মাখনের স্নিগ্ধতা, পুষ্টিকারিতা, চাক্‌চিক্যতা দূরীভূত করিয়া তাহার সুপ্ত পিচ্ছিলতাকে জাগাইয়া দিবে, ইহা আর নূতন বা বিস্ময়ের কথা কি? সত্য সত্যই আমাদের মাখন সুরবালা ঠাকুরাণীর সদ্‌গুণে ও পরামর্শ-প্রভাবে পূর্ণের বিরুদ্ধচারিণী হইয়া উঠিল। প্রতিপদে স্বামীকে আবমাননা, স্বামীকে অবহেলা অশ্রদ্ধা করা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠিল। পূর্ণ যাহা করিতে চাহে, মাখন তাহাতেই বাধা দিতে লাগিল। সুরবালা ঠাকুরাণী নানা যুক্তি দিয়া মাখনকে বুঝাইয়াছেন যে, তটিনীকে যখন আজ হউক কাল হউক বিবাহ দিতে হইবে, তখন ঘরের তৈয়ারী ছেলে কলিকে হারাই কেন? কোথায় কোন অজানা স্থানে গিয়া পড়িবে, ঠিক নাই। এমন সোনার চাঁদ ছেলে কয়টী পাওয়া যায়? তটিনী যেমন রূপে, তেমন গুণে, ইহার সহিত এমন ছেলেরই বিবাহ হওয়া উচিত। এই দেখ না, মিঃ দের ভ্রাতুষ্পুত্রী

তাহার জন্য পাগল। অঙ্গুরী বদল পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। দেখ, মাখন, এখনও সময় আছে, আমি কলিকে বাজাইয়া দেখিয়াছি, তাহার মত আছে। শুধু মত নহে, সে তটিনীকে পাইলে আর অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। সে তটিনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। সুতরাং তুমি যদি মত দেও, তবে আমি এই বিবাহ এক্ষণে করাইয়া দিতে পারি।

সুরবালা ঠাকুরাণীর পাল্লায় যিনি পড়িয়াছেন, তিনি আর নিষ্কৃতি পান নাই। মাখন ত কোমলই, শক্ত জিনিষই তাঁহার নিকটে নরম হইয়া যায়। মাখন তাহার স্বভাব-সুলভ মাখনতায় গলিয়া গেল। বুঝিল, স্বামীর বৃদ্ধ বয়স, মতিচ্ছন্ন অবস্থা। তাহার কথা শুনিলে কাজ হইবে না। সুরবালা দিদী যাহা বলেন, তাহাই ঠিক, স্বামীর কথা শুনিব না।

তৃতীয় দর্শন

হরিষে বিষাদ

১৯১৯ সনের ৭ই জুলাই। বেলা পাঁচটা। পূর্ণ কুমিল্লার বাড়ীতে বসিয়া নিবিষ্টমনে সংবাদপত্র পড়িতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ ক্রিং ক্রিং ক্রিং শব্দ তাহার কাণে প্রবেশ করিয়া তাহার চক্ষু দুইটীকে বাহিরের দিকে টানিয়া আনিল। পূর্ণ দেখিল, সম্মুখে টেলিগ্রাম হস্তে পিয়ন। টেলিগ্রাম কেহ আস্তেধীরে খুলে কিনা জানি না। পূর্ণ উহা পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি ছিঁড়িল। খুলিয়াই দেখিল, "Tatini passed in the first division"—তটিনী প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে। তটিনীর এই আই, এ পাশের সংবাদ আসিবামাত্রে কেমন করিয়া পূর্ণের বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। গৃহখানি বন্ধুবান্ধবের আগমনে একটু আলোড়িত হইয়া উঠিল।

ঘণ্টাখানেকের পর যখন এই শুভ সংবাদের ঢেউ থামিল এবং গৃহখানি একটু শান্ত ভাব ধারণ করিল, তখন পূর্ণ মাখনকে ডাকিয়া বলিল, "মাখন, তটিনীর বিবাহের চেষ্টা করা দরকার কি ? না আরও পড়িবে ?"

মাখনের পার্শ্বেই তটিনী বসিয়া নখ দিয়া মেজেতে কত কি লিখিতে বা আঁকিতেছিল এবং আকাশ পাতাল কত

কি ভাবিতেছিল, সেই জানে। তটিনী জাতিতে স্ত্রী; তা'তে আবার "আই, এ" প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিয়াছে— ইহাতে হৃদয়ের ফাঁটালগুলিতে জমাট ভাবগুলি বাষ্পাকারে বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। এখন কত শত ভাবের উত্থান পতন হইতে থাকে, কত সুখস্বপ্ন ডানা মেলিয়া উড়িতে থাকে, তাহা কি সকলে বুঝিবে? যাহাদিগের এরূপ ডানা জন্মে,তাহারাই জানেন। তটিনীর বুকের ভিতর কি নড়াচড়া করিতেছিল, কেন সে মাটীতে পশুপক্ষী আঁকিতেছিল আর মুছিতেছিল, তাহা সেই জানে—যাহারা তটিনীর অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহারা জানে, আর জানেন অন্তর্য্যামী।

পূর্ণ মাখনের সহিত যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, তখন তটিনী অন্যমনস্ক থাক্ আর নাই থাক্, অন্ততঃ তাহাকে ঐরূপ দেখাইতেছিল। তখন যে প্রস্তাবটী চলিতেছিল, উহা তটিনীর সম্বন্ধে—তাহার ইহজীবনের সুখদুঃখের একমাত্র মাপকাঠি! সুতরাং চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তি অনুসারে তটিনী তাহার অন্যমনস্কতা হারাইতে বাধ্য। তখন সে অযাচিতভাবে উত্তর করিল "বাবা, ও কি বল্‌ছ? তুমি না আমাকে কতদিন বলেছ, বি, এ, পাশ না করিলে বিবাহ দিবে না, আজ বি, এ, পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই

কেন বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করলে ? আমি বি, এ, পড়্‌ব ; বি, এ, পাশ করিয়া তবে বিবাহের কথা ভাবিব।” মাখনও তটিনীর সঙ্গে আহুতি দিল এবং বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিল। শুধু বিরক্তি কেন, এমনি একখণ্ড ক্রোধ-মেঘের সঞ্চার হইল যে, তাহারা পূর্ণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বৈকালিকী চা পান হইতে বিরত হইল।

কাল, দেহের ঘাগুলি ত শুকায়ই, মনের ঘাও শুকায়। বিশেষতঃ রজনীর তিমিরাঞ্চল যতই প্রসারিত হইয়া ধরণীর দেহে পড়িতে থাকে, জীবগুলি ততই নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতে থাকে। নিশার অবসানে যখন প্রাতঃকালের দূতগুলি নানা উপায়ে অরুণোদয় জ্ঞাপন করিতে থাকে, তখন সমস্ত জীব অল্পাধিক পরিমাণে জানিতে পারে যে, তাহার পূর্ব্ব দিবসের ক্ষতগুলি শুকাইয়া গিয়াছে কিংবা শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহাকে বৃদ্ধি বলি, তাহাও শুষ্কতার কার্য্য। ইহাই প্রকৃতির স্বভাব। নিদ্রাকে এইজন্য সন্তাপহারিণী বলে। কিন্তু আজ মাখন ও তটিনীর নিকট প্রকৃতি স্ব-ভাব হারাইয়া অ-ভাবগ্রস্ত ! পরদিবসও মাখন ও তটিনী উত্তপ্ত ও বিমর্ষ ! পূর্ণ, তুমি এমন কি বলিয়াছিলে যে, উহাদের এরূপ দুরারোগ্য ব্যাধি হইল !— এক রাত্রির নীরবতায় ও ঔদাসীন্যে তাহা সারিল না !

আলো ও আঁধার

আঁধার ও আলোক জিনিষ একটী হইলেও লোকে বলে, আলোক আঁধারকে ঘনীভূত করে, অর্থাৎ আলোক হইতে অন্ধকারে প্রবেশ করিলে সেই অন্ধকারটা অধিকতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আজ জুলাই মাসের ১৮ দিন। পূর্ণের বাড়ীতে খুব আনন্দের রোল। যদিও দশ দিবস পূর্ব্বে তটিনীর পাশের সংবাদ আসিয়াছে, তবুও তটিনী ও তাহার গর্ভধারিণীর মনের ঘা শুকায় নাই বলিয়া আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে কি আজ ঘা শুকাইয়াছে? সমস্ত দিন আনন্দে কাটিল। রাত্রি আট ঘটিকার কালে মিঃ ডে ও তাহার বন্ধু চক্রবর্ত্তী আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য উপস্থিত। কিন্তু এ কি! আবার অন্ধকার কেন? যে গৃহের নিভৃত কোণগুলি পর্য্যন্ত শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, হঠাৎ তথায় মলিনতা কেন? মিঃ ডের আগমনে তটিনীর বদনকমল যেমন উৎফুল্ল হইয়াছিল, হঠাৎ তাহার অন্তর্ধানে সেই কমল ম্লান ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল! এ কি? আলো ও অন্ধকারের এ কেমন সম্বন্ধ?

তটিনী খাইবার ছলে দু'এক গ্রাস মুখে দিয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। হৃদয়গগনে যখন মেঘ আসিয়া

উপস্থিত হয়, তখন তাহা বদনে, অঙ্গভঙ্গিতে ও আলাপ-ব্যবহারে ধরা পড়িতে চাহে। মানুষও আবার তাহার প্রকাশে যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করে। আজ তটিনীর চিত্তে যে বিষাদের মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহা পাছে অপর কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে সে যথারীতি খাইল এবং শুইল বলিয়া লোককে দেখাইল। কিন্তু তাহার বদনের বিষণ্ণতায়, ব্যবহারের অপ্রফুল্লতায় ভিতরকার সেই মেঘের অনেকটা আভাস পাওয়া যাইতেছিল। আহারে অরুচিতে আরও অনেকটা ধরা পড়িল। বাকীটা রহিল শয়নে। তটিনী লোকচক্ষুকে প্রতারণা করিবার জন্য শয্যায় নিদ্রার ছলে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রার ভাণ করিতে লাগিল। কারণ, শুইবার কিছুক্ষণ পরেই পূর্ণ তাহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তটিনী, তটিনী, ঘুমুচ্ছিস্ নাকি ? তোর কি হইয়াছে, আজ তুই খে'লি না কেন ? অমন শীঘ্র শীঘ্র চুপ চাপ, করিয়া শুইয়া পড়িলি কেন ? বল মা, তোর কি হইয়াছে !" পূর্ণের এইপ্রকার সস্নেহ ও উদ্বেগপূর্ণ কাতর বচনেও তটিনীর কপট নিদ্রা ভাঙ্গিল না। তটিনী নীরব, যেন ঘুমে অচেতন !

হতাশ হইয়া পূর্ণ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজে শয্যাগ্রহণ করিয়া মাখনকে তটিনীর এই বিমর্ষতার কারণ

জিজ্ঞাসা করিল ; এবং কথাচ্ছলে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "তটিনী কি কলিকে বিবাহ করিতে চায় ?" প্রখর শীতে জর্জ্জরিত ফণী যেমন পথিকের পদাঘাতে হঠাৎ ফণা বিস্তার করিয়া বিষ উদ্‌গিরণ করিতে থাকে, পূর্ণের এই উক্তি কপট নিদ্রায় অভিভূতা ও কলির বিচ্ছেদে জীবনীশক্তিহীনা তটিনীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র, সে কপট নিদ্রার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অমনি আলুলায়িত-কেশে ক্রোধভরে শয্যায় উঠিয়া বসিল এবং বৃদ্ধ ও স্নেহশীল পিতা পূর্ণচন্দ্রকে নানা কুকথা বলিতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্র কন্যার এইপ্রকার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না এবং কন্যাকে অসঙ্গত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিল। ফলে, গৃহে একটা ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি হইল।

যখন শুধু কোলাহলে ব্যাপারের মীমাংসা না হইয়া গৃহে কেবল অশান্তিই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন বঙ্কিম বলিল,"আজ কলি তটিনীকে একখানি পত্র দিয়া গিয়াছে। তখন হইতেই তটিনীর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ফুটন্ত দুগ্ধে কিঞ্চিৎ জল পড়িলে তাহা যেমন স্বীয় পূর্ব্ব আকার ধারণ করে, এই ভীষণ কোলাহলও তেমনি বঙ্কিমের এই সামান্য রহস্যভেদে নীরবতা প্রাপ্ত হইল।

কুসুমে কীট

তৎপর দিবস পূর্ণ কার্য্যোপলক্ষ্যে পশ্চিমগাঁয়ে কাটাইয়া রাত্রিতে কুমিল্লায় ফিরিয়া আসিয়া তটিনীকে সেই অবস্থায়ই দেখিল। কে যেন তাহার সহজ ও যৌবন-সুলভ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রাত্রিকালে কন্যাকে আর কিছু না বলিয়া পূর্ণচন্দ্র পর দিন প্রাতঃকালে কন্যার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া মধুরবচনে ও অনুনয়সহকারে তাহার উক্তির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তটিনী ক্ষমার বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া চুপ্ করিয়া রহিল।

ভূ-পৃষ্ঠের যত গলিত দূষিত পদার্থ ধৌত ও বহন করিবার জন্য জলের স্রোত এবং আর্দ্রতা দূরীভূত করিবার জন্য তপনদেব কাহারও চিত্তের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং জগতের কোন বাধাবিঘ্ন না মানিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিয়া যায়। আজ পূর্ণের গৃহের অশান্তির জন্য তপনদেব স্বীয় কর্ত্তব্যের কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করিল না। দেখিতে দেখিতে বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। তখন পূর্ণের বন্ধু ইন্দুবাবু আসিয়া আমন্ত্রণ করিয়া তটিনীকে তাঁহার আলয়ে লইয়া গেলেন। তখন পূর্ণচন্দ্র অবসর বুঝিয়া মাখনকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

মাখন উত্তরে জানাইল, তটিনীর বিষয় এমন নিখুঁতভাবে আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যুবতী শিক্ষিতা কন্যার বিষয় লইয়া সে কেন অমন কোলাহল করে; ইহা সে আদৌ পছন্দ করে না।

মাখনের কথায় পূর্ণের কিছুমাত্রও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই ব্যাপারে মাখনের সহানুভূতি আছে। সুতরাং পূর্ণ অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া মাখন ও কলির ব্যবহার গর্হণ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ, পূর্ণের উপস্থিতিতে পূর্ণের বাড়ীতে আসিয়া পূর্ণের কন্যার প্রতি প্রতিপালিত কলির এতাদৃশ উদ্ধত ও নির্লজ্জ ব্যবহারে, সে কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য বিধান করিতে পারিল না। নানা চিন্তা আসিয়া তাহার সন্দিগ্ধ চিত্ত জ্বালাইয়া তুলিতে লাগিল।

কেউটে সাপ

বর্ষার অবিরত ধারায় যখন ধরিত্রী সিক্ত হইয়া পড়ে, তখন তপনের ক্ষণিক তাপদানে তাহা শুষ্ক হইয়া উঠে। দেহে যখন কোন ক্ষত হয়, তাহাও ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়। এমন কি, কালের বিচিত্র স্বভাবে পুত্রহীনাও অসহনীয় পুত্রশোক বিস্মৃত হয়। কিন্তু যৌবনকালে নর ও নারীর চিত্তে কি এক অদ্ভুত ক্ষত হয়, তাহা কালে সারাইতে পারে না, বরং নালী ঘার ন্যায় তাহা দিন দিন সমস্ত চিত্ত গ্রাস করিয়া ফেলে। দেখিতে দেখিতে এক মাস চলিয়া গেল। তটিনী কলিকাতায় বি, এ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নিদাঘের প্রখর সূর্য্যতাপে যেমন ফল্গুর দৃশ্যমান সলিলপ্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু বালুকার নিম্নভাগে জলরাশি লুকায়িত থাকে, তদ্রূপ তটিনীর বাহিরের বিষণ্ণতা এই সুদীর্ঘকালে শুকাইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু চিত্তের নিভৃত কক্ষে সেই অচিন্ত্য অভাবনীয় অসহনীয় ভাবের সত্ত্বা আজও সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

আজ পূর্ণের গৃহে আবার সেই কেউটে সাপ। হঠাৎ মিঃ ডে আসিয়া পূর্ণের গৃহে উপস্থিত। পূর্ণের ক্রোধ ক্ষণিক, ক্ষমাই তাহার স্বভাব। কলিকে পূর্ণ কি না করিয়াছে! সেই শীর্ণ মলিন দেহে দীনহীন ভিখারীর

বেশে মাতাপিতৃহীন দশ বৎসর বয়স্ক কলি যখন ফরিদপুরে পূর্ণের স্নেহের অধিকারী হইল—ক্রমে মাখন ও পূর্ণের চতুর্থ পুত্ররূপে তাহারই পরিবারভুক্ত হইয়া লালিতপালিত ও শিক্ষিত হইল—পূর্ণ নিজের সুখবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া কত অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকে বিলাতে শিক্ষিত করিল। সেই কলি আজ পূর্ণকে দংশন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোটখাটো দংশন নহে। কন্যার প্রতি লোভ !! বিশেষতঃ ভগিনীতুল্যা ও বিভিন্নজাতিত্বজন্য পরিণয়ের অযোগ্যা ! পূর্ণ এই ভীষণ অকৃতজ্ঞতা ও কপটতা ভুলিয়া গিয়া কলিকে পূর্ব্ববৎ স্নেহসহকারে আদরে গ্রহণ করিল এবং মধুর সম্ভাষণ, আহারের যত্ন, ইত্যাদি ত করিলই, অধিকন্তু বিদায়কালে তাহাকে কুমিল্লা ষ্টেসনে উঠাইয়া দিতে গেল। কলি গাড়ীতে উঠিবার কালে পূর্ণ নীচে দণ্ডায়মান থাকিয়া একথা সেকথার পরে করজোড়ে বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল, "কলি, তোমাকে কতদূর ভালবাসি, তাহা তুমি জান, তুমি ও শ্রীশ আমার নিকট এক। আমার এই বার্দ্ধক্যে তোমার নিকট একটী ভিক্ষা ! তটিনী বি, এ পড়িতেছে, তাহার অধ্যয়নে তোমাদ্বারা কোনপ্রকার বিঘ্ন না হয়। আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত ! তোমাকে আমি করজোড়ে অনুরোধ করি, তুমি আমার

এই সঙ্কটকালে আমার সহায় হও—তটিনীর বিবাহলালসায় তুমি আহুতি দিও না। উহাকে বি, এ, পাশ করিতে দাও, তখন আমি তোমারই হস্তে তটিনীকে অর্পণ করিব।”

জ্বলন্ত তৈলে জলবিন্দুপ্রক্ষেপে তাহা যেমন শীতল না হইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, পূর্ণের এই শীতল, কাতর প্রার্থনায় কলির বিরহজ্বলিত চিত্ত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই ভীষণ অগ্নির লেলিহান জিহ্বায় পূর্ণকৃত সমস্ত উপকার—সমস্ত মধুর সম্ভাষণ, সমস্ত কাতর ক্রন্দন ভস্মীভূত হইয়া গেল। সে তাহার স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া অবজ্ঞাভরে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল “আপনি কে? আপনার কথা শুনিতে আমি বাধ্য নহি। আমি অতদিন অপেক্ষা করিতে পারিব না। আজ আগষ্ট মাসের ২৮ তারিখ। আমি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই তটিনীকে আমার সঙ্গিনী করিব।”

উপকৃত যুবক কলির অদ্ভুত কথায় বৃদ্ধ উপকর্ত্তা পূর্ণ-চন্দ্র কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল তাহার আর উত্তর করিবার সামর্থ্য রহিল না।

আকাশ পাতাল

একদিকে স্নেহ, আদর, যত্ন, উপকার ইত্যাদিতে তৈয়ারী আকাশ—অপর দিকে নিষ্ঠুরতা, অনাদর, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতিতে নির্ম্মিত পাতাল—পূর্ণ এই দুই ভাবিতে লাগিল। যদিও একজাতিত্বের অভাব যুবক-যুবতীর মিলনে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তবু কলি ও তটিনী পরস্পর যে প্রীতির ফাঁস গলায় পড়িয়াছে, তাহাতে পূর্ণচন্দ্র ভাবিতেছিল, যাক্ ফাঁসি যখন খসান যাইবেই না, জাত্যংশে অসম্ভব হইলেও কন্যাকে বি, এ পাশ করাইয়া কলির হাতেই সমর্পণ করিব। কুমিল্লা ষ্টেসনে কলির বাক্যবাণে বিদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ণ এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার কাতর অনুরোধের উত্তরে সে কুরুচিপরিচায়ক ব্যবহার পাইল ও স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য শ্রবণ করিল, তখন সে স্থির করিল, এইরূপ যুবকের হস্তে কিছুতেই তাহার তটিনীকে সমর্পণ করিবে না। বিশেষতঃ তটিনী সরলা সুকোমলহৃদয়া ও লজ্জাশীলা, তাহাকে কিছুতেই এমন ক্রূর ও লোভীর হস্তে অর্পণ করিব না। গাড়ীর পিত্তলের দণ্ডে দক্ষিণ বাহু, কাষ্ঠসোপানে দক্ষিণ পদ রাখিয়া পূর্ণ অন্য-মনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল "মানুষগুলি কি

এই রকমই ! পাশ্চাত্য শিক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইলে কি মানুষগুলি এইরূপ হইয়া দাঁড়ায় ; উঃ, বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে মানুষ করিয়াছি, সে আজ আমারই বুকে ছোঁড়া বসাইতে উদ্যত ! হা পুত্র শ্রীশচন্দ্র ! তুমি কি মনোবিজ্ঞানে এমনই পণ্ডিত ছিলে যে, একদিন আমাকে সাবধান করিবার ছলে বলিয়াছিলে 'বাবা সাবধান ! যে কলিকে এত যত্নে মানুষ করিলেন, তাহাদ্বারা আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ও সজ্ঘাতিক লোক !' তখন তোমার কথায় আমি কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, আমি তোমাকে উপহাস করিয়াছিলাম !" শ্রীশ-চন্দ্রের এই কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। পূর্ণ সংসারের নানা চিত্রের প্রতি মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া কত কি দেখিতে পাইল। বর্ত্তমান শিক্ষা, বর্ত্তমান সভ্যতা, বর্ত্তমান সমাজ, বর্ত্তমান আচার ব্যবহার—কত কি আলোচনা করিতে করিতে নিজকে শত সহস্রবার ধিক্কার দিতে লাগিল। এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িবার বংশীধ্বনি হইল। সে বিষণ্নবদনে ম্লানচিত্তে বাড়ী ফিরিল। কলি বিদায়কালে পালকপিতাকে অভিবাদন করা দূরে থাকুক, তাহার সহিত একটী কথাও বলিল না। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া চট্টগ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

কাঁটা দিয়া কাঁটা খোলা

কাঁটা দিয়াই কাঁটা খুলিতে হয়। কলি যখন তটিনীকে অবিলম্বে বিবাহ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, যখন তটিনীর ক্ষণেক অদর্শন তাহার নিকট যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, যখন সে তটিনীহীন স্বর্গকে নরক বলিয়া মনে করিতে লাগিল—তখন সে লৌহদ্বারা লৌহ-খণ্ডকে কাটিবার আয়োজনে মনোনিবেশ করিল। এই ভাবে সে উত্তপ্ত লৌহ পূর্ণচন্দ্রকে ইচ্ছামত আকার প্রদান করিবার জন্য তাহার পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতিকে নিয়োগ করিল।

তৃতীয় পুত্র সুরথচন্দ্র ঢাকায় বি, এ, পড়ে। পাঠ্যা-বস্থায় যুবকগণ পাঠেই ব্যাপৃত থাকে। সাংসারিক কোলাহলে বড় প্রবেশ করিতে চাহে না। কলি ভাবিল, সুরথ ও আমি প্রায় সমবয়স্ক—এক সঙ্গে লালিত পালিত হইয়াছি। তাহাকে যদি কিছু উপকার করিতে পারি, তবে সে আমার বাধ্য হইবে এবং আমার ইচ্ছার অনুকূল কার্য্য করিবে। তখন—বেঙ্গল রেলওয়েতে একজন "আসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট" এর প্রয়োজন হওয়ায় কলি নিয়োগকর্ত্তা সাহেবকে বলিল, "আমার পালক-পিতার ছেলে ঢাকায় আছেন। এবার বি, এ, দিয়াছে। যদি আপনি তাঁহাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করেন, তবে

আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছুটা উপায় করা হয়।” এই কথা শুনিয়া সাহেব সুরথকে দেখিতে চাহেন। তখন কলি সুরথকে টেলিগ্রাম করিয়া চট্টগ্রামে আনে এবং সাহেবের নিকট উপস্থাপিত করে। সাহেব সুরথের যৌবনসুলভ সুন্দর কান্তি, কার্য্যতৎপরতা, বাক্পটুতা ক্রীড়াপটুতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। সুরথ কলির নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া তাহার হাতের পুতুল হইল।

সুশীলা ঠাকুরাণী বঙ্কিমের স্ত্রীর দিদীমা। তিনি অল্প বয়সেই একটীমাত্র কন্যা হইবার পরেই স্বামীর কর্ত্তৃত্ব হইতে চিরতরে অবসর পান। সেই কন্যাই বঙ্কিমের স্ত্রী। সুশীলা ঠাকুরাণী বঙ্কিমের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। সুতরাং, তিনিই আইনানুসারে বঙ্কিমের সংসারের কর্ত্রী। বঙ্কিম তাঁহার হাতের পুতুল। তাঁহার পরামর্শ ছাড়া বঙ্কিম কোন কাজই করে না। সুতরাং কলি ভাবিল, সুশীলা ঠাকুরাণীর আনুগত্য স্বীকার করিলেই বঙ্কিমকে পাওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া সে তাঁহার প্রতি খুব আনুগত্য দেখাইতে লাগিল। ফলে, বঙ্কিম বৃদ্ধ পিতার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। পিতার প্রতিকার্য্যে বাধা দেওয়া, তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করিয়া নানাপ্রকার

কটূক্তি করা ইত্যাদি কার্য্য প্রতিনিয়তই করিতে লাগিল। একদিন পূর্ণ আহারে বসিয়াছে, এমন সময়ে কথার উত্তেজনায় বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধ পিতাকে আহারকার্য্য হইতে বিরত করাইয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন। মাখন ত পূর্ব্বেই তরুবালা ঠাকুরাণীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও তরুবালা ঠাকুরাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বাধীনচেতা ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ণের কোন কথাই তাহার বিকৃত কর্ণে আর রুচিকর বোধ হয় না—পূর্ণের কোন কার্য্যই তাহার অনুমোদিত হয় না। পূর্ণ দক্ষিণে চলিল, তিনি উত্তরে যাইবেন। আমরা এখানে একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই মাখনের স্বামিভক্তি বা স্বামিপ্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইব।

একদিন চট্টগ্রাম হইতে পূর্ণের কুমিল্লায় প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েক দিন পরে মাখনের নিকট তটিনীর একখানি পত্র দেখিতে পাইয়া সে বলিল, "মাখন, আজ দুই সপ্তাহ যাবৎ তটিনীর কোন সংবাদই পাই না, এজন্য বড়ই চিন্তিত আছি। দেখি, পত্রে কি লিখিয়াছে?" মাখন বিরক্তি ও ক্রোধ সহকারে উত্তর করিল "কেন, তুমি কি তোমার পত্র আমাকে দেখাও যে, আমি তোমাকে আমার পত্র দেখাইব? আমি তোমাকে পত্র দেখাইব না!"

চতুর্থ দর্শন
মিঃ দে'র দৌত্য

কলি ধূমকেতুর ন্যায় হঠাৎ কুমিল্লায় আসিয়া হঠাৎ চলিয়া গেল। পূর্ণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, তটিনীর সহিত দেখা করাই তাহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। কয়েক দিনের ছুটীতে তটিনী কলিকাতা হইতে কুমিল্লায় আসিয়াছিল। তখনই কলির আগমন। শুধু আগমন নহে; তটিনী লোকলজ্জায় এবং সুযোগ ও অবসরের অভাবে নূতন প্রীতির অঙ্কুরগুলি কলিকে একটী একটী করিয়া দেখাইবার সুবিধা না পাওয়ায়, পত্রে সেগুলি পূর্ণভাবে অঙ্কিত করিয়া কলির হাতে দিয়াছে। কলি তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া ট্রেনে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে করিতে টের পাইল না সমস্ত রাত্রি কি ভাবে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিল, গাড়ী চট্টগ্রাম ষ্টেসনে উপস্থিত!

আজ অক্টোবর মাসের ১৯ দিন। পূর্ণ সান্ধ্য চা পান করিতেছে, আর শরতের নীল আকাশের গায়ে অস্তোন্মুখ রবির ম্লান ছবি দেখিতেছে, এমন সময়ে এক-খানি টেলিগ্রাম উপস্থিত। চট্টগ্রামের তদানীন্তন

ওভারসিয়ার মিঃ সি, সি, দে মহাশয় পূর্ণকে আহ্বান করিয়াছেন। টেলিগ্রাম পাইয়া পূর্ণ রাত্রি বারটার গাড়ীতে চট্টগ্রাম যাত্রা করিল। পর দিবস প্রাতঃকালে চট্টগ্রামে পৌঁছিয়াই পূর্ণ ওভারসিয়ার সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া মিঃ দে ও তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। মিঃ দে পূর্ণকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ণকে পার্শ্বের চেয়ারে বসাইলেন এবং একখানি পত্র পূর্ণের হাতে দিয়া বলিলেন, "পূর্ণ, এই পত্রে আমাদের মাথা কাটা যায় না কি ? এই দেখ, পড়।" এই বলিয়া একখানি পত্র পূর্ণের নিকট ধরিলেন। পূর্ণ দেখিল কলির নিকট তটিনীর প্রেমপত্র। কয়েক পংক্তি পড়িয়া আর পড়িতে পারিল না, উহাতে এতই প্রেমোচ্ছ্বাস যে, পিতা তাহা পড়িতে কুণ্ঠা বোধ করিল। তখন পত্রপাঠে বিরত হইয়া পূর্ণ মিঃ দেকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন কেন ?" উত্তরে মিঃ দে বলিলেন "আমি তোমাকে বিশেষ অনুরোধ করি, তুমি এই বিবাহে বাধা দিও না ; উহারা দুইজনে যে ভাবে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বিবাহ বন্ধ করা যাইবে না। তুমি কোনরূপে অন্তরায় হইও না। আমি রেলকর্ত্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি, কলি বিবাহ করিলে, তাহাকে আসামে বদলি

করা হইবে। সুতরাং তাহারা তোমার প্রতি কোনপ্রকারে উৎপাত করিবে না। তুমি স্ত্রী পুত্র লইয়া নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে।”

এই বলিয়া তিনি পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে কলিকে ডাকাইয়া আনিলেন। কলি পূর্ণকে দেখিয়া কোনপ্রকার অভিবাদন, কুশলজিজ্ঞাসা বা অন্যকোন বিষয়ের অবতারণা করিল না। যেন সে কখনও পূর্ণকে দেখে নাই বা পূর্ণের সঙ্গে যেন তাহার কোন পুরুষে আলাপ ও পরিচয় নাই। কলি আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং ওভারসিয়ার মিঃ দেকে বলিতে লাগিল “তটিনী এই চিঠিখানি আমাকে লিখিয়াছে। আমি এই চিঠিখানি আপনাকে ১৮ই অক্টোবর তারিখে দিয়াছিলাম। আপনি সেই দিনই পূর্ণ বাবুকে আসিতে টেলিগ্রাম করেন।” পূর্ণ তখন মিঃ দের কথায় উত্তরে বলিল “আমি বিবাহে বাধা দিব না সত্য, কিন্তু অনুমতিও দিব না। আমার কন্যা আমাকে না জানাইয়া কাহাকেও বিবাহ করিবে না, এইরূপ লিখিয়া জানাইয়াছে। কলি অনর্থক তাহাকে বিবাহে উত্তেজিত করিতেছে।” এই কথা বলায় তটিনীর কলিকে বিবাহ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, এই মর্ম্মে তটিনীর একখানি পত্র তখন মিঃ দে পূর্ণের হস্তে দিলেন। তখন পূর্ণ বলিল,

"কন্যার বি, এ, পাশ করিবার আর বৎসরখানেক বাকী আছে, বি, এ, পাশ করিয়া সে যাহাকে বিবাহ করিতে চাহে, আমি তাহার সহিতই উহাকে বিবাহ দিব। কোন প্রকার আপত্তি করিব না। এখন এই বিবাহে আমি কোন মতেই সম্মত নহি।" এই কথা শুনিয়া মিঃ দে বলেন "যদি তোমার কন্যা তোমার অমতে বিবাহ করে, তবে তুমি কোনরূপে আদালতে যাইতে পারিবে না।" পূর্ণ উত্তর করিল "আমি আদালতে যাইব না।"

তৎপর পূর্ণ তথা হইতে তখনই কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রমণীমোহন দাসের নিকট একখানি টেলিগ্রাম করিল, "I do not give my consent nor authorise any body to make *sampradan* of my girl—অর্থাৎ কলির সহিত আমার কন্যার বিবাহে আমার কোনপ্রকার সহানুভূতি বা অনুমতি নাই। বিবাহে সম্প্রদানকার্য্যে আমি কাহাকেও ক্ষমতা বা অনুমতি প্রদান করিতেছি না।"

বিবাহ

বগুড়াতে পূর্ণচন্দ্রের যে পিতৃভূমি ছিল, তাহাতে সে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উদ্দেশ্য বার্দ্ধক্যে শান্তিতে দিন কাটাইবে। সে কৈলাস ও সতীশচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছে, সকল ভাইকে সেই বাড়ীতে থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকারও দিয়াছে। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে কৈলাস ও ললিতচন্দ্রের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্বার্থের মনোহারিণী ছবি তাহাদিগের চিত্ত হইতে সদ্‌গুণরাশি অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে কি করিয়া তাহারা স্বীয় স্বীয় সন্তানাদি লইয়া নিরুপদ্রবে সেই বাড়ীতে বাস করিবে, সেই চিন্তায় ব্যস্ত। সুতরাং প্রতিপদে পূর্ণের সহিত শত্রুতাচরণ করিতেছিল।

পূর্ণ যখন চট্টগ্রামে মিঃ দের সহিত সাক্ষাৎ করিল, তখনই বুঝিতে পারিল, একটা বড় ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। এবং কে কে এই ষড়যন্ত্রের ভিতরে আছে, তাহাও বুঝিতে পারিল। যাহাদিগকে প্রাণপ্রিয় মনে করিত, একে একে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহারা এই সঙ্কটে শুধু উদাসীন নহে, পূর্ণকে জব্দ করিবার জন্য ব্যস্ত। তখন পূর্ণ দেখিল, যশোহরে ভ্রাতা সতীশচন্দ্র

ও বগুড়ায় পুত্র শ্রীশচন্দ্র এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় নাই। সে গত্যন্তর না দেখিয়া যশোহরে সতীশচন্দ্রের নিকট চলিয়া গেল। সতীশ তথায় পুলিশের দারোগা। সতীশ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই পূর্ণকে সঙ্গে করিয়া কুমিল্লাভিমুখে যাত্রা করিল; এবং বগুড়াতে শ্রীশচন্দ্রকে টেলিগ্রামে জানাইল, সে যেন পোড়াদহে তাহাদের সহিত মিলিত হয়। তাহারা পোড়াদহে আসিয়া দেখিল, শ্রীশ আইসে নাই। তথায় একদিন শ্রীশের জন্য অপেক্ষা করিয়া পূর্ণ ও সতীশ কুমিল্লায় চলিয়া গেল। কুমিল্লায় পৌঁছিয়া দেখিতে পাইল, বঙ্কিমের অনুমতি অনুসারে মাখন ও সুরথ তটিনীকে লইয়া বিবাহের জন্য ঢাকায় চলিয়া গিয়াছে। দুই দিনের পথশ্রম ও ক্লান্তির পরে রাত্রি বারটার সময়ে কুমিল্লায় পঁহুছিয়া এই সংবাদ পাইয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনরায় তখনই রাত্রি দুইটার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া পর দিবস বেলা দশটায় ঢাকায় পৌঁছিল।

ঢাকা সূত্রাপুরে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র গুপ্ত বাস করেন। তিনি মাখনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাখনের মাতাও তথায় বাস করেন। পূর্ণ ঢাকা ষ্টেসনেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। সতীশ যাইয়া মাখনের মাতার নিকট মাখন ও

তটিনী কোথায় আছে, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "মাখন ও তটিনী কোথায় আছে, জানি না, তবে আজ রাত্রিতেই বিবাহ হইবে। কোথায় বিবাহ হইবে, জানি না।" এইরূপে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া সতীশ তাহার বক্তব্য মাখনের মাতার নিকট বলিয়া চলিয়া আইসে। পূর্ণ সমস্ত দিন ঢাকা ষ্টেসনে অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় উদ্বিগ্ন চিত্তে কাটাইয়া সতীশকে লইয়া পুনরায় অপরাহ্নের গাড়ীতে কুমিল্লায় যাত্রা করে। চাঁদপুর হইতে পূর্ণ কুমিল্লায় ও সতীশ যশোহরে চলিয়া গেল।

একদিন যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পিতাকে আহার করিবার পূর্ব্বেই বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেয়, তখনই পূর্ণচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকে। পূর্ণ ঢাকা হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কুমিল্লায় এই বাড়ীতে উঠিল। চারি পাঁচ দিন পরে পূর্ণ সংবাদ পাইল, তটিনীর বিবাহ সমাধা করিয়া মাখন সন্তানাদি লইয়া বঙ্কিমের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছে। তাহারা পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহের কোন সংবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার কোন সংবাদই লইল না। নিজেরা মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

ত্রিপুরা গাইড্

বঙ্কিম পুলিশের কর্ম্মচারী। ১৯১৯ সনের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে পিয়ন অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে একখানি সংবাদপত্র দিয়া গেল। বঙ্কিম অন্যান্য চিঠিগুলি পড়িবার পূর্ব্বেই দেখিল "Tippera Guide" ত্রিপুরা গাইড্। দোষী ব্যক্তির মন সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ থাকে। আবার, কুসংবাদ বায়ুর অগ্রে ধাবিত হয়। তখন এই-জাতীয় অনেক নীতিবাক্য বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় সত্তঃ তোলপাড় করিতেছিল। সুতরাং "ত্রিপুরা গাইড্" পাইয়াই চিত্তে তড়িদ্বেগে একটা অদ্ভুতভাব আসিয়া ধাক্কা মারিয়া গেল। অমনি মোড়ক ছিঁড়িবামাত্র তাহার চক্ষে বড় বড় অক্ষরে একটি হেডিং পড়িল—

"একটী অদ্ভুত ও অসাধারণ হিন্দু বিবাহ"

"আমরা অদ্ভুত সময়ে বাস করি। বিবাহব্যাপারেও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে কন্যার বিবাহকার্য্যে পিতার আধিপত্য এত অধিক যে, তাহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। পিতার অমতে হিন্দুকন্যার বিবাহ হয় না, ইহাই প্রচলিত রীতি। যখন আমরা এই রীতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাহার সম্পূর্ণ অসন্তোষ বিধানপূর্ব্বক কোন

হিন্দুকন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে, তখন আমরা সেই বিবাহকে অসাধারণ বিবাহ ব্যতীত আর কি বলিব ! পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অসম্মতিক্রমে এইরূপ বিবাহে সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট হইবে এবং ইহা অত্যন্ত ঘৃণা, লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, এবং যে পরিবারে এইরূপ অসাধারণ অদ্ভুত বিবাহকার্য্য ঘটে, তাহার যশঃ ও সম্মান কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস অবসরপ্রাপ্ত সব্ ডেপুটী কালেক্টর। তিনি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার। পূর্ণবাবু কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারিণী এবং বি, এ পড়িতেছিলেন।

সেদিন (১৯১৯ সনের ২৪শে অক্টোবর) তাঁহার কন্যা মিঃ—এর সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন। তিনি বিলাতপ্রত্যাগত একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং রেলের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার। হিন্দুমতে হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহ-পদ্ধতিতে বিবাহ হইয়াছে। পূর্ণবাবু জাতিতে বৈদ্য, মিঃ—জাতিতে কায়স্থ। ইহা অসবর্ণে বিবাহ। পূর্ণবাবুর পুত্র এবং স্ত্রী তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অসম্মতিক্রমে তাহার কন্যাকে মিঃ—এর নিকট বিবাহ দিয়াছেন! স্বভাবতঃ

পূর্ণবাবু এই বিবাহে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছেন এবং এই কার্য্য তাঁহার মর্ম্মন্তুদ হইয়াছে। আমরা তাঁহার পুত্র এবং স্ত্রীর ব্যবহার ও আচরণ কোনপ্রকারেই সমর্থন করিতে পারি না এবং এইরূপ ব্যবহার অসঙ্গত ও অনুচিত বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি। মিঃ—এর ব্যবহারও ভাল নহে। তিনি ছিলেন একজন অনাথ বালক, পূর্ণ বাবুই তাহাকে আশ্রয় দিয়া লেখাপড়া শিখান এবং বিলাতে রাখিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা দেন। মিঃ— যখন জানিতে পারিলেন যে, এই বিবাহে পূর্ণ বাবুর কোন প্রকারে সহানুভূতি বা সম্মতি নাই, তখন তিনি কেমন করিয়া তাঁহার উপকর্ত্তার কন্যাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিলেন? এই বিবাহ হইতে অনেকে অনেক কথা শিখিতে পারিবেন এবং ইহা একটী আখ্যায়িকারূপে অনেক কাল জগতে বিদিত থাকিবে।"

পৌত্রী-দর্শন

দেখিতে দেখিতে শরৎকাল কাটিয়া গেল। ক্রমে হেমন্ত, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ঋতু চলিয়া গেল। আবার শরতের নীল আকাশ দেখা দিল। পূর্ণচন্দ্র কুমিল্লায়ই বাস করিতেছে। এই ছয় ঋতুর আবর্ত্তনে জগতের যেমন অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, পূর্ণের হৃদয়েও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে তটিনী অনূঢ়া যুবতী ছিল, আজ সে একটী কন্যা ক্রোড়ে করিয়া ক্ষুণ্ণ পিতার চরণপ্রান্তে উপস্থিত! অপরাধিনী কন্যা নবজাত শিশু কন্যাটীকে সশ্রদ্ধচন্দন সুকোমল পুষ্পের ন্যায় পিতার চরণপ্রান্তে রাখিল। ক্ষমাশীল স্নেহশীল পিতা তটিনীর ক্রোড় হইতে পৌত্রীকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া সকল ক্লেশ সকল অপরাধ ভুলিয়া গেল। পৌত্রীকে চুম্বন এবং বক্ষে ধারণ করায় যে আনন্দপ্রবাহ হৃদয়ে ছুটিল তাহার প্রখরতায় পূর্ব্ব এক বৎসরকালের সঞ্চিত ক্রোধ, বিরক্তি সমস্ত ধৌত হইয়া গেল। পূর্ণ ভাবিতে লাগিল "ভগবান্, তোমার লীলা তুমিই জান। আমার কন্যা যখন সুখে আছে, তখন আর চিন্তা কি? কন্যাকে সৎপাত্রে বিবাহ দেওয়াই ত মাতাপিতার কর্ত্তব্য। যে রকমেই বিবাহ

হউক না কেন, কন্যা যখন সুখে আছে, আর আমার কষ্টের কারণ থাকিতে পারে না।"

পূর্ণচন্দ্র ! যে কার্য্যকে তুমি অন্যায়, অসঙ্গত, অসম্ভব, ধর্ম্মহীন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলে, যে কার্য্যে তোমার কোনপ্রকার সহানুভূতি বা সম্মতি ছিল না—যে কার্য্যের জন্য তোমার পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই তোমার শত্রু হইল, আজ তুমি সেই কার্য্যের জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছ ! আজ সেই কার্য্যকে ন্যায্য, সঙ্গত, সম্ভব, ধর্ম্ম্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছ। পূর্ণচন্দ্র, বলিতে পার কি, কে এই কার্য্যের বিচার করিতেছে ? যদি বিচারক একজনই হইয়া থাকে, তবে তাহার বিচারে এমন পার্থক্য হয় কেমন করিয়া ? যাহার বিচারে তুমি অসৎকে সৎ, অন্যায়কে ন্যায় বলিতেছে, সে ত আবার এই বিচার ফেলিয়া দিবে না ? সাবধান !

কন্যা, জামাতা ও পৌত্রীকে লইয়া পূর্ণচন্দ্র বেশ আনন্দে কয়েক দিন কাটাইল। তাহার চিত্তে আর কোন ক্ষত আছে বলিয়া সে বোধ করিল না। কন্যা ও জামাতার সঙ্গে পূর্ণ মাখন প্রভৃতিকে লইয়া আসাম ভ্রমণে চলিল। লাম্‌ডিং, গৌহাটী, কামাখ্যা, শিলং প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিল।

ভ্রাতায় ভ্রাতায়

ললিতচন্দ্রের ওষ্ঠ শশকের ওষ্ঠের ন্যায় দ্বিখণ্ড ছিল এবং লেখাপড়ায় তাহার তেমন স্ফূর্ত্তি ছিল না। অনেকে মনে করিয়াছিল, ললিতচন্দ্র সংসারে কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। ললিত সুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা ওষ্ঠ সেলাই করাইয়া তাহার জন্মগত অঙ্গের বিকলত্ব দূরীভূত করে এবং সাধারণ লেখাপড়া অধিক শিক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া সবজজের সেরেস্তাদারের উচ্চ পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯২১ সনের—মাসে ললিত চন্দ্রের তৃতীয় কন্যার বিবাহকার্য্য উপস্থিত জানিয়া পূর্ণচন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হইয়া জানাইল, ললিত, তোমার কন্যার বিবাহে আমি এক হাজার টাকা সাহায্য করিব। ললিত পূর্ণের এই প্রস্তাব শুধু অগ্রাহ্য করিল, তাহা নহে, পূর্ণকে সেই প্রস্তাবের বিষয় কিংবা বিবাহের কথা কিছুই জানাইলেন না। কোন্ দিন কিভাবে বিবাহ হইয়া গেল পূর্ণচন্দ্র জানিতেও পারিল না।

ভ্রাতা ললিতচন্দ্রের ব্যবহারে পূর্ণচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে; কিন্তু তাহার মনে বিশেষ কিছু লাগিল না। কারণ, ইহা অপেক্ষা অধিকতর গ্লানিজনক ঘটনা তাহার জীবনে

ঘটিয়াছে। তবুও মনুষ্যের একটা স্বভাব এই, জানিবার জন্য একটা কৌতূহল হয়। যে ভ্রাতাকে পূর্ণ কত স্নেহ করিয়াছে, যে ভ্রাতার উন্নতির জন্য পূর্ণ কতই না চেষ্টা করিয়াছে, আজ সেই ভ্রাতা কেন এমন ব্যবহার করিল, কেন তাহার অজ্ঞাতসারে কন্যার বিবাহ দিল, কেন তাহার প্রস্তাবিত এক হাজার টাকা গ্রহণ করিল না —এবংবিধ বহু তর্ক ও সংশয় তাহার চিত্ত আলোড়ন করিতে লাগিল। ফলে ১৯২১ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর সে রাত্রি সাড়ে বারটায় বগুড়ায় পৌঁছিল। বগুড়ার বাহির বাড়ীতে পূর্ণের যে বৈঠকখানা-ঘর ছিল, রাত্রির অবশিষ্টাংশ সে সেখানে কাটাইল।

বগুড়ার বাড়ীতে ললিতচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র সপরিবারে বাস করে। তখন পূর্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশচন্দ্র, তৃতীয় পুত্র সুরথচন্দ্র এবং পূর্ণের ভগিনী জ্ঞানদাও তথায় ছিল। তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে পূর্ণ কৈলাসচন্দ্রের শয়নকক্ষে যাইয়া ইহাদের সকলের সমক্ষে বলিতে লাগিল "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তেষট্টি বৎসর বয়স। জানি না কোন্ মুহূর্ত্তে চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিব। যে কয়েকটা দিন বাঁচিয়া আছি, আমি এখানেই কাটাইতে ইচ্ছা করি; কেন না এই বৃদ্ধ বয়সে অল্প আয়ে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অন্যত্র থাকা

সুবিধাজনক নহে। এক্ষণে সমস্ত বিষয়কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। সুতরাং, আমার অন্যত্র থাকিবার কোন প্রয়োজনও নাই। এই বাড়ীর প্রাচীরের বাহিরে যে স্থানে উমেশ সেন বাস করিতেন, আমি সেইস্থানে একখানি ঘর তুলিয়া বাস করিব। বাড়ীর ভিতরে আমার যে সাবেক একখানি টিনের ঘর আছে, তাহা তুলিয়া সেখানে বসাইব।”

পূর্ণের এই কাতর বাসনায় কৈলাস সকলের সমক্ষে কোন আপত্তি করিল না। তাহার এতাদৃশ ব্যবহারে পূর্ণ যারপর নাই আনন্দ লাভ করিল এবং কৈলাসের নিকট অজ্ঞানকৃত যাবতীয় ক্রটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

কিন্তু পর দিবস কৈলাসচন্দ্র আর পূৰ্ব্ববৎ বৈঠকখানায় না আসিয়া নিজের ডিস্‌পেনসেরিতে বসিয়া কার্য্য করিল। এইভাবে পাঁচদিন কাটিয়া গেল। ষষ্ঠ দিবসে পূর্ণের প্রস্তাবিত গৃহের কার্য্য আরম্ভ হইল। কুলিগণ রান্নাঘরের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, পূর্ণ বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া আছে। এমন সময়ে ললিতচন্দ্র বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিল। কুলিরা পূর্ণের নিকট যাইয়া নালিশ করিল। পূর্ণ তাহাদিগকে কাজে লাগিতে বলায়, তাহারা আবার কাজে লাগিল। কিন্তু ললিত

পুনরায় বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার ভৃত্য তিলককে ঘর ভাঙ্গিবার আদেশ প্রদান করিল। তাহার এতাদৃশ আচরণে পূর্ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ললিত, এ কি কর? ঘর ভাঙ্গ কেন? যদি বলিবার থাকে, আমাকে বল, আমি ব্যবস্থা করিতেছি।" কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ললিত নিজ হস্তে দুইটী খুঁটি তুলিয়া, বাকীগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিল। পূর্ণের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশ এবং বন্ধু শান্তিরঞ্জন সেন ও পূর্ণের ভৃত্য উপেন্দ্র বারান্দায় দণ্ডায়মান থাকিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ এই সব ঘটনা দর্শন করিতেছিল।

বিজয়া দশমী

আজ বিজয়া দশমী। হিন্দুর পক্ষে এই দিনটা একটা বিশেষ দিন। আর্ত্ত বা অর্থার্থী ব্যক্তি নিজ ক্লেশ দূরীভূত করিবার কিংবা অর্থ প্রাপ্তির জন্য দেবীর আবাহন করিয়া আজ তাঁহাকে বিদায় দিবে। কামনা পূর্ণ হওয়ায় দেবীকে আর চায় না। যে মূর্ত্তির নিকট চারি দিবসকাল কত সুস্বাদু আহার্য্য, কত সুগন্ধ পুষ্প প্রদত্ত হইয়াছে, যাঁহার সম্মুখে কত সুগন্ধই জ্বলিয়াছে, যাঁহার সম্মুখে

ভক্তগণ করযোড়ে দাঁড়াইয়া হৃদয়ের কত ব্যথা জানাইয়া কত কি মাগিয়াছে, যাঁহার পূতদেহ যে সে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, পূজকও অতি পবিত্রদেহে পবিত্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত স্পর্শ করিতে দ্বিধা করিত, আজ সেই দেহ যে সে স্পর্শ করিতেছে, এবং স্থান হইতে বিচ্যুত করিতেছে! কয়েক মাস ধরিয়া যে দেহখানি নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং যে দেহখানি কত দিব্য বস্ত্রে দিব্য অলঙ্কারে সুশোভিত করা হইয়াছিল, আজ সেই দেহখানি মৎস্যাদির কণ্ডুয়ন-যন্ত্রে পরিণত হইবে! ভাবুকের নিকট এইরূপ কত ভাব আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। গৃহিণী যখন বরণডালা লইয়া দেবীকে বিদায় দিতেছেন, তখন দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে, বদনে বিষাদের ছায়া। যাঁহার আগমনে গৃহখানির অন্তরে বাহিরে আনন্দের ছবি প্রতিফলিত হইতেছিল—আজ সেই গৃহের নিভৃত কোণেও আনন্দের কণামাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না!

যাঁহারা বিশেষ ভাবুক নহেন কিংবা যাঁহারা দেবীকে আহ্বান করেন নাই—তাঁহারা দশহরা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ছেলেমেয়েরা উত্তম সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। পূর্ণচন্দ্র প্রিয় পুত্রকন্যা, বঙ্কিমের স্ত্রী ইন্দুবালা ও মাখনকে সঙ্গে

লইয়া দশহরা দেখিতে গিয়াছে। গৃহে সুশীলা ঠাকুরাণী, বঙ্কিম ও সুরথ! কুমিল্লার বাসাবাড়ীর সকলেই গেল, এই তিন মূর্ত্তি গেলেন না। কেন?

ছেলে বটে!

পূর্ণচন্দ্র বগুড়ায় কনিষ্ঠের নিকট মর্মন্তুদ ব্যবহার পাইয়া কুমিল্লায় ফিরিয়া আসিল। মাখন, বঙ্কিম ও সুরথের নিকট ভ্রাতাদের অপমান ও দৌরাত্ম্যের কথা বলিল। বৃদ্ধ স্বামী ও পিতার প্রতি এইপ্রকার অমানুষিক ও অন্যায় আচরণে পত্নী কিংবা পুত্র কেহই বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। বরং বৃদ্ধ পূর্ণচন্দ্রকে নানাপ্রকারে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। সে যখন আদালতের আশ্রয়ে তাহার ন্যায্য স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিল এবং বলিল "অর্থ উপার্জ্জন করা হয় কেন? শুধু পেটে খাইবার জন্য নহে। অর্থ দ্বারা মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয়। ললিত আমাকে আমার অর্থে নির্ম্মিত বাড়ী হইতে এইভাবে অপমানিত করিয়া বাহির করিয়া দিল, আর আমি তাহা নীরবে সহ্য করিব! আমি নিশ্চয়ই বিচারালয়ের সাহায্য লইব।" এইকথা তাহাদিগকে

জানাইলে, তাহারা সকলে একযোগে চটিয়া উঠিল এবং পূর্ণকে থামাইতে লাগিল। পূর্ণ যখন তাহার অস্তিত্ব বলবৎ রাখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন যোগ্যপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে বলিল "যদি তুমি আমাদের কথামত কাজ না কর, তবে তোমাকে খাওয়াপরা দিব না।" তখন পূর্ণ স্পর্দ্ধাসহকারে নির্য্যাতনপ্রাপ্ত সর্পের ন্যায় বলিল "আমি তোর নিকট খাওয়া পরা চাই না। তুই এই অপোগণ্ড শিশুগুলিকে খাওয়া পরা দিবি ত।" "যদি কাকাদের সহিত মোকদ্দমা কর, তবে তাহাও দিব না।" পুত্রের এইপ্রকার অপ্রত্যাশিত ও অন্যায় উত্তরে পূর্ণ বলিল "তবে, এক্ষণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যা!" পিতার এই কথা সহ্য করা কলির ধর্ম্ম নহে। পূর্ণ কথাটী বলিবার পূর্ব্বে ভুলিয়া গিয়াছিল, ইহা কলিকাল। উপযুক্ত ও উপার্জ্জনকারী পুত্র সুরথ সেই দিবসই যেন পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত রাখিয়া কার্য্যস্থল লামডিঙে এবং বঙ্কিমচন্দ্র তৎপর দিবস কার্য্যস্থল চাঁদপুরে চলিয়া গেল। বাকী রহিল মাখন। তাহার কোন কার্য্যস্থল থাকিলে, তিনি কি করিতেন, জানি না। নিজের পায়ে ফোসকা পড়িলে, তাহা হজম করিয়া যেমন নূতন জুতা পরিধান করিয়া আমরা অবলীলাক্রমে চলাফেরা করি এবং দর্শককে

জানিতে দিই না, প্রতিপাদবিক্ষেপে ফোস্কার কি প্রভাব অনুভূত হইতেছে, তদ্রূপ মাখন স্বামীর প্রতি ক্রোধ ও বিরক্তি ভিতরে ভিতরে হজম করিতে না পারিলেও বাহিরে হজমের লক্ষণ দেখাইয়া স্বামীর গৃহেই অবস্থান করিল।

খোকা

পূর্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্রের ডাক-নাম "খোকা"। খোকা ম্যাট্রিকুলেসন পর্য্যন্ত পড়িয়া ঢাকা 'মিট্‌ফোর্ড মেডিকেল' স্কুল হইতে 'সব-এসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন' হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। খোকা চিকিৎসাবিদ্যায় অল্প সময়ের মধ্যে এমনই কৃতিত্ব দেখাইল যে, সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল ক্যাম্বেল, কর্ণেল হল প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১৯১১ সালে দিল্লীদরবারে পূর্ববাঙ্গালার জন্য যে তাঁবু হয়, তথায় কর্ণেল হলের অধীনতায় খোকা কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়, এবং অত্যন্ত পরিশ্রম, দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

১৯১৪ সালে যখন জর্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন কয়েক জন প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্রান্তে খোকা কোয়েটাতে যুদ্ধক্ষেত্রে

বদলি হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন সে বদলি রোধ করিতে পারিল না, তখন সে :চাকরি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। চাকরি পরিত্যাগ করিয়া খোকা কিছু দিন পিতার নিকট ও কিছু দিন অন্যত্র ছিল। তখন পূর্ণের ইচ্ছা হইল, খোকাকে বগুড়ায় বসায়। সেখানে তাহার নিজের বাড়ীতে থাকিবে এবং বগুড়ায় স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ পূর্ণের তৃতীয় ভ্রাতা বগুড়ায় ডাক্তার—এক্ষণে তাহারও বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পসারটা যাহাতে কালক্রমে খোকা পাইতে পারে, ইহাও পূর্ণের গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল চিন্তা করিয়া পূর্ণ খোকাকে বগুড়ায় রাখাই স্থির করিল। ইতঃপূর্ব্বে একবার পূর্ণ খোকাকে ঢাকাতে ডিস্‌পেন্‌সারী করিয়া তথায় বসাইবার প্রয়াস করিতেছিল, কিন্তু তখন যুদ্ধের জন্য ঔষধের মূল্য দশগুণ বলিয়া অনেক অর্থের প্রয়োজন এবং যুদ্ধ থামিয়া গেলে পুনরায় ঔষধের মূল্য কমিবে—ইহাতে হঠাৎ যে লোকসান হইবে, তাহা পূরণ করা কঠিন হইবে। এই ভাবে চারিদিক্ বিবেচনা করিয়া স্থির করিল, খোকাকে বগুড়াতে বসাইব।

অমনি ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্রের নিকট পূর্ণ তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। কৈলাসচন্দ্র জানাইলেন "আমার ভাতিজাকে

(খোকাকে) যা' তা' ভাবে বগুড়ায় বসাইতে পারি না! তাহার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়া আমি স্থান খরিদ করিব ও পাঁচ হাজার টাকা দিয়া ডিস্পেন্সারি করিয়া দিব। তাহা না হইলে কি তাহাকে বগুড়ায় বসাইতে পারি?" এই মর্ম্মে পত্র পাইয়া পূর্ণ উত্তরে জানাইল "আমি বাল্যকালে যাত্রাগানে শুনিয়াছিলাম, 'আধ মণ তৈলও পুড়িবে না, সখীও নাচিবে না'। কৈলাসের এত টাকা কবে হইবে যে, পনর হাজার টাকা ভাতিজাকে দিবেন। এ সমুদয় না বসানের কথা।"

পূর্ণের এই কথা শুনিয়া কৈলাস তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং নানাপ্রকারে পূর্ণের সর্ব্বনাশ সাধনে ব্যস্ত হইল। পূর্ণের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ভ্রাতার মনোগত ভাব ভাল নহে। সুতরাং, সে স্থির করিল, খোকাকে নিশ্চয়ই বাড়ীতে বসাইতে হইবে। এই মনে করিয়া সে ১৯১৭ সনে খোকাকে পাঠাইয়া দিল এবং বলিল "তুমি যাইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াও। কাকা যদি তোমাকে সাহায্য করেন, তবে ভালই, নতুবা আমি তোমার খরচপত্র চালাইব।"

মতি-পরিবর্ত্তন

খোকা পূর্ণের প্রথম সন্তান। সৌদামিনী খোকাকে শিশুকালে পূর্ণের ক্রোড়ে ফেলিয়া চিরতরে চলিয়া যায়। সেই অবধি পূর্ণ তাহাকে মাতার ন্যায় সস্নেহে লালনপালন করিয়াছে। পূর্ণের অন্যান্য পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই তাহার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার তৈলে তখনও দুইটী প্রদীপ পূর্ণের গৃহে জ্বলিতেছিল—একটী খোকা, দ্বিতীয়টী ভ্রাতা সতীশচন্দ্র। সুতরাং ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র দেখিলেন, পূর্ণের গৃহের আর সবগুলি বাতিই তাহাকে আলোকদানে বিরত হইয়াছে, এক্ষণে শ্রীশচন্দ্রই (খোকা) তাহার বার্দ্ধক্যের নিবিড় অন্ধকারে একমাত্র উজ্জ্বল প্রদীপ। ইহাকে ম্লান করিতে পারিলেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয়। এই মনে করিয়া শ্রীশের কর্ণে প্রতিকূল বায়ু প্রবেশ করাইতে লাগিল। শ্রীশকে কাছে পাইয়া কাণে খুব আপাততঃ মধুর কথা দ্বারা ও বাহিরে খুব স্নেহ দেখাইয়া তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং বুঝাইতে লাগিল, "দেখ শ্রীশ, তটিনীর বিবাহে তোমার বাবার সহানুভূতি না থাকিলে কি এমন একটা অসম্ভব কার্য্য হইতে পারে! দাদা তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া তোমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন।

দাদার মাথা খারাপ, জাতিহীন। বুদ্ধিশুদ্ধি একবারে লোপ পাইয়াছে। তোমাকে বোকা পাইয়া মিথ্যাকথা দ্বারা তোমাকে হাত করিয়া রাখিয়াছে।” শ্রীশচন্দ্র চিরকালই পিতার খুব অনুগত। এবং শ্রীশই একদিন পিতাকে কলির বিষয়ে সাবধান করিয়াছিল। সেই শ্রীশচন্দ্র কৈলাসচন্দ্রের কুহকে পড়িয়া বিগড়াইয়া গেল। পিতার প্রতি তাহার ভাব বদলাইয়া গেল। তাহার পূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্থানে ঘৃণা ও বিদ্বেষ আসিয়া প্রবেশ করিল! শ্রীশ পূর্ব্বে তাহার ভ্রাতাদিগকে লিখিত ‘পিতাকে অর্থদ্বারা সাহায্য করা পুত্রের একান্ত কর্ত্তব্য। তোমরা অবশ্য এই কর্ত্তব্য পালন করিবে’। পূর্ণচন্দ্র যখন পেন্‌সন লইয়া কিয়ৎপরিমাণে অর্থের অভাব বোধ করিতেছিল, তখন সে সেই শ্রীশের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কিছুই পায় নাই। কারণ তখন শ্রীশ কৈলাসের ইঙ্গিতে চলে! ইহারই নাম ‘মনের ধর্ম্ম।’ মনের উপাদানই সঙ্কল্প ও বিকল্প অর্থাৎ গড়া ও ভাঙ্গা। যাহাকে আজ ভাল বলে, কাল তাহাকেই খারাপ বলিবে। মনের বিচারে যাহারা চলে, তাহাদের সকলেরই এই গতি। আমরা পরে দেখিব, মন কি না করে এবং মনোধর্ম্মই আমাদের যত অনর্থ সৃষ্টি করে।

দীপনির্ব্বাণ

এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ১৯২২ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী। এই সময়ে পূর্ণ সপরিবারে ঢাকায় ১নং অক্ষয়দাসের লেনে বাস করে। পূর্ণ কার্য্যোপলক্ষে চট্টগ্রাম গিয়াছিল, সেই দিবস ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি করিয়াছে পর, মাখন বলিল "শ্রীশের ভয়ানক অসুখ। এই দেখ, বঙ্কিমের চিঠি।" বঙ্কিমের চিঠি পড়িয়া পূর্ণ অবাক্ হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশের সাঙ্ঘাতিক পীড়া, অথচ এ বিষয়ে পিতাকে কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই। বঙ্কিম চিঠি ও টেলিগ্রাম পাইয়া বগুড়ায় চলিয়া গিয়াছে। যদিও শ্রীশ কয়েক বৎসর যাবৎ পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল, কিন্তু স্নেহশীল ও ক্ষমাশীল পিতা তাহা পূর্ব্বাপরই সহ্য করিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে পুত্রের পীড়ার সংবাদে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পুত্রের ও ভ্রাতাদের অসদ্ব্যবহার তুচ্ছ করিয়া বগুড়ায় যাত্রা করিল।

পর দিবস তথায় পৌঁছিয়া শ্রীশের অবস্থা দেখিয়া পূর্ণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া পুত্রের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পূর্ণ বাড়ী আসিয়াছে, ইহাতেও ললিত ও কৈলাসের চিত্তের পরিবর্ত্তন হইল না। তাহারা পূর্ণের প্রতি সশ্রদ্ধ ও সদয় ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তাহার

সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিল না ! শ্রীশ রুগ্ণ শয্যায় পড়িয়া কাতরনয়নে পিতার বদনপানে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না। চাহনিতে কৃতজ্ঞতা, অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা ও পিতার আগমনে আনন্দ ও আশ্বাস পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত হইতেছিল।

ঢাকা হইতে বগুড়ায় যাইতে প্রায় একদিন লাগিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আহারাদি হয় নাই বলিয়া এবং বিশ্রামের অভাবে পূর্ণ অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে খাইতে বলিল না। এমন সময়ে রামলগন খানসামা আসিয়া বলিল "বাবু, চা খান"। ক্লান্ত পূর্ণ চা খাইয়া ক্লান্তি দূর করিল। রাত্রিকালে বন্ধু ললিত দত্তের বাড়ী যাইয়া পূর্ণ অন্ন গ্রহণ করিল এবং সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলিয়া একটু হৃদয়ের বোঝা কমাইল।

কালেক্টরীর হেড্ কেরাণী শ্রীশবাবুর বাসাবাড়ীর বারেন্দায় পূর্ণ থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিল। আহারের ব্যবস্থা ললিত বাবুর বাড়ীতেই রহিল। এইভাবে ছয় দিবস কাটিয়া গেল। শ্রীশচন্দ্রের জীবনপ্রদীপ দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল। সপ্তম দিবস রাত্রিকালে সেই প্রদীপটী চিরতরে নিভিয়া গেল।

পঞ্চম দর্শন

ষোলকলা পূর্ণ

পূর্ণের বয়স এক্ষণে চৌষট্টি। সৌদামিনীর গর্ভজাত সন্তান শ্রীশচন্দ্র ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। প্রমোদিনীর (পুণ্টীর, গর্ভজাত পুত্র বঙ্কিম (বোকা) ও সুরথচন্দ্র (টোকা) এক্ষণে বড় চাকুরে। বঙ্কিম হাবড়ায় ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ, সুরথ আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের আসিষ্ট্যাণ্ট ট্রেফিক সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট চট্টগ্রামে। মাখনের গর্ভে বিমল (চোকা), নির্ম্মল (নেকা) ও অমল (ভেকা) নামে তিন পুত্র এবং তটিনী ও লতিকা (ভূত্নী) নামে দুই কন্যা। ইহাই এক্ষণে পূর্ণের সংসার।

পাখীর ছানাগুলির ডানা না হওয়া পর্য্যন্ত উড়িতে পারে না, তখন উহারা বাধ্য হইয়া মাতাপিতার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটায়। কিন্তু ডানা হইলেও কিছুদিন উহারা মাতা পিতাকে ছাড়িয়া যায় না। কাছে কাছে থাকে। আচ্ছা, মানুষের ত ডানা হয় না, তবুও নাকি উহারা উড়ে? হাঁ, বোকা ও টোকা পুরুষ, উহাদের ডানা ফুটিয়াছে—উহারা এক্ষণে স্বেচ্ছায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। তটিনী মেয়ে হইলেও

ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। চোকা, নেকা, ভেকা—পুত্রত্রয় ও ভূত্নী কন্যা! ইহাদের এখনও ডানা গজায় নাই। মাখন অনেক দিন খাঁচায় থাকায় যে ডানা দুইটী একটু ভারি ও উড়িবার অযোগ্য হইয়াছিল, এক্ষণে কিছুকাল খাঁচা-ছাড়া থাকায় এবং এদিক্ সেদিক্ একটু আধটু উড়ায়, ডানা দুইটী বেশ উড্ডয়নক্ষম হইয়াছে। সে এক্ষণে কোন্ দেশের কোন্ আকাশের নীলিমায় গা মিশাইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে উড়ে, তাহা জানা বা বলা ৬৪ বৎসর বয়সের পূর্ণের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে পাখীকে পূর্ণ পোষ মানাইয়া দুধ ছাতু খাওয়াইয়া, পায়ে নূপুর পরাইয়া, নিজকে ধন্য মনে করিতেছিল, আজ সেই পাখী এমনই ভাবে ঠোক্‌রাইতেছে যে, পূর্ণ দূরে থাকিয়াও সেই ঠোকরের দৌরাত্ম্য পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতেছে। যে মাখনকে পাইয়া পূর্ণ একদিন বলিয়াছিল "কে বলে সংসার দুঃখের?" আজ সেই মাখনে পূর্ণের বৃদ্ধ ও শীর্ণ পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়াছে। দেখি, পা-ই দুর্ব্বল, না, মাখনই পিচ্ছিল!

পীড়া না ফাঁকি ?

১৯২২ সনের ১৩ই মার্চ্চ। মাখনের একটী সন্তান অকালে জীবনহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইল। মাতা সন্তানের মুখদর্শনমানসে কত ক্লেশ সহ্য করিতেছিল, কত আশা করিতেছিল, আজ সেই ক্লেশের অবসান হইল বটে, কিন্তু নিরাশ হওয়ায় ও অকালে সন্তান নির্গত হওয়ায় তাহার দেহে ও মনে গ্লানি উৎপন্ন হইল। মাখন অসুস্থ, এই সংবাদ আত্মীয়মহলে ছড়াইয়া পড়িল। সুতরাং চারি দিক্ হইতে শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য লোকজন আসিতে লাগিল। ইহারা আসে আর চলিয়া যায়। কিন্তু এই উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটী মূর্ত্তি আসিয়া আর যাইতে চাহে না। মাখনের শুশ্রূষা, মাখনের চিত্ত-বিনোদন জন্য ইহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। মাখনের ভ্রাতা, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ও আমাদের পরিচিত সেই প্রতুলচন্দ্র ও তাহার 'স্বামী' সুরবালা ঠাকুরাণী এক্ষণে মাখনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী! মাখনের মাতাঠাকুরাণীও ইঁহাদের সঙ্গে থাকিতেন।

আজ কাল করিয়া একমাস চলিয়া গেল, তবুও মাখন নীচে নামে না। কয়েক বৎসর ধরিয়াই মাখন পিচ্ছিলতার পরিচয় দিতেছিল। পূর্ব্বের হাত লাগিলেই মাখন

পিছলাইয়া যাইত—কিন্তু অপরের নিকট বেশ লাগিয়া থাকিত। পূর্ণচন্দ্র স্বীয় স্বাভাবিক ক্ষমা ও ঔদাসীন্যে সেই পিচ্ছিলতা উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মাখনের মাখনত্বই দেখিতেছিল। কিন্তু এখন মাত্রাটা যেন কেমন বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ণের এই বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে যথারীতি সেবাশুশ্রূষা করা, তাহার কথামত চলা, তাহার আহারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা, এই সব কার্য্যে মাখন অদ্ভুত ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিল।

১২ই এপ্রিল তারিখে পূর্ণ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত দিনের উপবাস, বেলা ৩টা। মাখন ত পূর্ণের কোন সংবাদ লইলই না, ছেলে আসিয়া পূর্ণকে সংবাদ দিল, মার শরীর অসুস্থ, রান্না হয় নাই। পূর্ণ রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া বন্ধু সুকুমার বাবুর বাসায় যাইয়া খাইয়া আসিল। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ও সুরবালা ঠাকুরাণী তখন পূর্ণের বাসায় আসিলেন। মাখনের মাতাও আসিলেন। পূর্ণ তাঁহাকে বলিল, "ইনি (সুরবালা ঠাকুরাণী) এখানে আসেন কেন? আমি ইঁহাকে দেখিতে পারি না। যদি আপনার কন্যা সত্যই অসুস্থা হইয়া থাকে, তবে আপনাদের সূত্রাপুরের বাসায় লইয়া গিয়া তথায় চিকিৎসা করুন।"

তিনি এই কার্য্যে সম্মত হইলেন না। ভেকাও পূর্ণের সহিত দেখা করিল না। মাখন তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা পূর্ণ নেকাকে ভেকার কথা জিজ্ঞাসা করায় নেকা বলিল "ভেকা উপরে। তুমি কখন আসিয়াছ?" বেলা তিনটায় আসিয়াছি, একই বাড়ীতে আছি, অথচ তিন ঘণ্টা পরে পুত্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কখন আসিয়াছ?" এদিকে মাখনের পীড়ার কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। স্বামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করা, পুত্রদিগকে পিতার নিকটে যাইতে না দেওয়া, ইহাই যেন পীড়ার প্রধান লক্ষণ হইয়া উঠিল। চক্ষের সাম্‌নে স্ত্রীর এতাদৃশ আচরণ পূর্ণ আর সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া দূরে থাকা স্থির করিল। কুমিল্লায় এই অভিনয় একবার হইয়া গিয়াছে। ঢাকায় এই লীলার দ্বিতীয় অভিনয় হইবে।

অদ্ভুত কিৰা আছে এর পর !

একই বাড়ীতে বাস, অথচ স্বামিস্ত্রীতে দেখাসাক্ষাৎ নাই, কথাবার্ত্তা নাই। স্ত্রী পীড়ার ভাণ করিয়া দ্বিতলে বাস করেন, ক্বচিৎ কখনও নীচে নামেন। স্বামীর উপরে যাওয়া নিষেধ, সে নীচের তলায় পচিয়া মরে। শুধু ইহাই নহে। অনেকদিন ভৃত্য আসিয়া বলে, "বাবু মা ঠাকুরুণ আপনার জন্য রান্না করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" ছেলেমেয়েগুলি পিতার সঙ্গে কথা বলিতে চাহে না—পিতার নিকটে আসে না। পূর্ণ কি করে, কহিতেও পারে না, সহিতেও পারে না।

২৯শে এপ্রিল, বেলা সাড়ে দশটার সময় ডাক্তার সুরেশ বাবু পূর্ণের বাসায় উপস্থিত। ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ ভদ্রভাবে পূর্ণের সহিত একথা সেকথা বলিয়া উপরে ভগিনীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। কিছুকাল পরেই তিনি নামিয়া পূর্ণকে বলিলেন "আপনি মাখন ও তাহার ছেলেপেলেকে দেখিবেন না?—আপনি তাহাদিগকে পোষণ করিবেন না? আপনি যেপ্রকার ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আপনার কর্ত্তব্যে যথেষ্ট ত্রুটি দেখিতে পাইতেছি।" ডাক্তার শ্যালকের এই কথা শুনিয়া পূর্ণ বিরক্তি ও ক্রোধের সহিত জিজ্ঞাসা করিল

"ইহা কি আপনার সিদ্ধান্ত?" উত্তর হইল "হাঁ"। প্রত্যুত্তরে পূর্ণ বলিল "যদি ইহাই আমার উদ্দেশ্য হইবে, তবে আমি নানাস্থান হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া এখানে আসি কেন? আমি অন্যস্থানে পড়িয়া থাকিতে পারি! আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি, আমার স্ত্রী নীচে আসে, আমার সহিত কথা বলে না! সে উপরে থাকে, আমি নীচে থাকি। সুরবালা ঠাকুরাণীর পরামর্শে সে চলে। এই সেদিন আমি বগুড়া হইতে আসিয়াছি, সে নীচে নামিয়া আহার করিয়া গেল, আমাকে খাইতে বলা দূরে থাকুক, আমার সহিত কথাটী পর্য্যন্ত বলিল না! স্ত্রীর এইজাতীয় অসদ্ব্যবহার সত্ত্বেও যে আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া এখানে আসিতেছি এবং নির্ল্লজ্জ পশুর ন্যায় এখানে বাস করিতেছি, ইহাতেও কি বোধ হয় না যে, আমি ইহাদিগকে লালন পালন করিতেছি এবং করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত?" উত্তরে কিছু বলিবার ছিল না। সুতরাং, ডাক্তার বাবু দশ মিনিট কাল চুপ্ করিয়া থাকিয়া যাইবার কালে বলিয়া গেলেন "লোকের নিকট চেঁচামিচি করিবেন না। তাহা হইলে ভাল হইবে না।"

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন

পথে কুড়ানো কলীন্দ্র যখন মিঃ ডে হইল, তখন তাহার সর্ব্বপ্রথম কৃতিত্ব হইল পালকপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা। বিশেষতঃ রূপের মোহে পড়িয়া তিনি তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যা ভুলিয়া গেলেন। এই বিদ্যার সাহায্যে জগতে সম্ভব অসম্ভব, অসম্ভব সম্ভব হয়, অচল চলে, চলন্ত জিনিষ অচল হয়, সমতল পাহাড় হয়, পাহাড় সমতল হয়—যদি এই বিদ্যার এত শক্তি থাকে, তবে মিঃ ডে তাহার বাসনাকে রোধ করিতে পারিলেন না কেন? পালকের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্নেহের পাত্রী ভগিনীস্থানীয়াকে প্রণয়পাত্রী ভোগের সামগ্রী করিবার জন্য অত ব্যাকুল হইলেন কেন? আমরা বহির্জ্জগতের কিংবা অন্তর্জ্জগতের ইঞ্জিনিয়ার নহি—সুতরাং এই ব্যাপার বুঝিতে পারিব কি করিয়া?

যেদিন পূর্ণচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিল, তটিনীকে মিঃ ডের ভোগের সামগ্রী হইতে দিবে না, সেই দিন হইতে, মিঃ ডে, তাহার পালক-মাতা ও সুরথ প্রতিজ্ঞা করিল, পূর্ণের মাথা কামাইতে না পারিলে আমাদের জীবনধারণ বৃথা! মিঃ ডে স্থির করিল, "ওরে বৃদ্ধ,

তোর মাথা খারাপ, বার্দ্ধক্যে তুই মতিচ্ছন্ন। আমার নবীন প্রীতির কোরক তুই ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত! দেখি, আমি তোর পুরাতন প্রীতির ফুটন্ত ফুলটী ধ্বংস করিতে পারি কি না! তোর সাজান বাগানে আমি কীট হইয়া প্রবেশ করিলাম। একে একে তোর সুখের পাঁপড়িগুলি কাটিয়া ছারখার করিব। তোর বুকের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তোকেই অশান্তির অনলে জ্বালাইয়া মারিব।"—সত্যই বটে। ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিজ্ঞা কি না অটুট থাকিবেই! কিন্তু তিনি এই প্রতিজ্ঞাটি অপরদিকে ঘুরাইয়া দিলে কত মঙ্গল হইত, তাহা কি ভাবিবার অবসর হইল না! তাহারই বা দোষ কি! কাল যে কলি!!

মিঃ ডে যুবক সুরথকে চাকরি দিয়া এবং মাতা মাখনকে আশাতীত আনুগত্য দেখাইয়া তাহাদিগকে হাতের পাঁচ করিয়া ফেলিয়াছে। ইঞ্জিনচালক যেমন ইচ্ছামত ইঞ্জিনগুলিকে চালায়, মিঃ ডে তদ্রূপ সুরথ, মাখন, বঙ্কিম প্রভৃতিকে চালাইতে লাগিল। ফলে কি হইল, তাহাই এক্ষণে আমরা দেখিব।

যেদিন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র পূর্ণকে তাহার বাড়ীতে বসিয়া শাসাইয়া গেলেন, সেদিন হইতে পূর্ণ স্থির করিল,

তাহার আর স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা চলিবে না। তাহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, কলির ও সুরবালা ঠাকুরাণীর পাল্লায় পড়িয়া মাখন মাখনত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং পা পিছলাইয়া পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গা অপেক্ষা উহাতে পদক্ষেপ না করাই ভাল। এইরূপ স্থির করিয়া পূর্ণ দ্বিতীয় পত্নী প্রমোদিনীর ভ্রাতা বীরেন্ বাবুর নারায়ণগঞ্জের বাসাবাড়ীতে চলিয়া গেল।

চোখের বাহিরে

কলহ নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ দূরত্ব। কথায় বলে, চোখে দেখিলেই ভুগিতে হয়। পূর্ণ বেগতিক দেখিয়া এই নীতির আশ্রয় লইল। শীতললক্ষ্যার শীতলতায় জুড়াইবার জন্য শীতললক্ষ্যার তীরে কিছুদিন বাস করিতে লাগিল। ফলে মাখন তাহার মনের সাধ পূরাইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার ও ছেলে মেয়ে লইয়া স্বাধীনভাবে থাকিবার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইল! আর বৃদ্ধ স্বামী আসিয়া বলে না "ওগো, পা'টা

বড় টাঁটাইতেছে, একটু টিপিয়া দিবে ? একটু বিছানাটা করিয়া দিবে ? সুরবালা ঠাকুরাণী তোমার কাছে আসে কেন ? ইত্যাদি"। সুতরাং পূর্ণের রাগ মাখনের কাছে লক্ষ্মী। এদিকে পূর্ণেরও একটা সুবিধা হইয়াছে। তাহাকে প্রতিপদে স্ত্রীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয় না। চক্ষের সাম্‌নে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য আর পূর্ণকে দেখিতে হয় না।

এমনভাবে একমাস কাটিয়া গেল। হঠাৎ পূর্ণের শরীর অসুস্থ হওয়ায়, বীরেন্ বাবু ও গোপালবাবু পূর্ণকে লইয়া আবার মাখনের কাছে আসিলেন। পূর্ণ নীচে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বীরেন্ বাবু ও গোপালবাবু উপরে মাখনের কাছে যাইয়া, ওকালতি আরম্ভ করিলেন। পূর্ণ ওকালতিটা শুনিতে পায় নাই। উকীলদ্বয় যখন বিরসবদনে হতাশ হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন "পূর্ণ বাবু, এখানে আমাদের ওকালতি খাটিবে না! আপনার এখানে থাকা হইবে না, চলুন, আমাদের চাঁদনীঘাটের বাসায়।" পূর্ণ উকীলদ্বয়ের সওয়ালজবাবে কিছুটা আস্থা স্থাপন করিত। অন্ততঃ কিছুটা প্রসন্নতার আশা করিতেছিল। কিন্তু উপরের উক্তি শ্রবণ করিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা

করিতে ইচ্ছা করিল না। পূর্ণের কাণে জল ঢুকিল। পূর্ণ মনে করিয়াছিল—এই দশ মাইলের দূরত্ব এবং এক মাসের অদর্শনে মাখনের ক্ষতস্থানগুলি শুকাইয়া ভরিয়া গিয়াছে। এখন তাহার আর চিহ্নও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এ কি? ঘা শুকান দূরে থাকুক। আরও যেন চিরিয়া বড় করা হইয়াছে! বীরেন্‌বাবুও পূর্ণকে অনেক ভরসা দিয়া আনিয়া বেকুব বনিয়া নীচে আসিয়া যখন পূর্ণকে বলিল "চলুন, আমাদের চাঁদনীঘাটের বাসায় যাই। এখানে আপনার স্থান হইবে না" তখন পূর্ণ বিনাবাক্যে তাঁহাদের অনুগমন করিতে বাধ্য হইল।

পূর্ণ চাঁদনীঘাটে যাইবামাত্র তাহার দ্বিতীয় পক্ষের শাশুড়ী,প্রমোদিনীর মাতা, ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বীরেন্, সংবাদ কি রে? পূর্ণকে এখানে আনিলি যে? সরযূ কেমন আছে? সরযূ কি বলিল?" উত্তরে বীরেন্ বাবু বলিলেন "মা, আমি পূর্ণবাবুকে লইয়া সরযূ দিদীর কাছে গিয়াছিলাম। অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া অনেক কথা বলিলাম! তিনি কিছুতেই পূর্ণবাবুর সঙ্গে একত্র বাস করিতে রাজী নহেন। শেষে বলিলেন, 'স্বামী মরিয়া গেলে কি স্ত্রী বাঁচে না! আমার স্বামী নাই'।" বৃদ্ধা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন

"অমন কথা সরযূ বলিতে পারে না। আমি সরযূকে জানি। সরযূ অমন মেয়েই নয়।" বীরেন্ বাবু যখন মাখনের নিকট ওকালতী করেন, তখন প্রমোদিনীর ভগিনীপতি কুসুমের স্বামী গোপালবাবু সঙ্গে ছিলেন। তিনিও পূর্ণের সঙ্গে চাঁদনীঘাট যান। বীরেন্‌বাবু মাতার বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া বলিলেন "মা, গোপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, মাখন দিদী ও কথা বলিয়াছেন কি না?" গোপালবাবুর সাক্ষ্যে বৃদ্ধা কাণে আঙ্গুল দিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। কারণ, সধবা স্ত্রীর অমন কথা বলা দূরে থাকুক, বিধবারও ও কথা বলা বা শ্রবণ করা নিষিদ্ধ; স্ত্রীজগতে এই আইনটী প্রচলিত আছে। শুনিলে কিংবা বলিলে শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অমঙ্গল হয়!

ষষ্ঠ দর্শন

স্বপ্নের ফল

স্ত্রীর মুখে জীবন্ত স্বামী শুনিল "স্বামী মরিলে কি স্ত্রী বাঁচে না ?" ইহা অপেক্ষা স্বামীর নিকট অধিকতর কষ্টকর আর কি হইতে পারে ? সুতরাং পূর্ণ চাঁদনীঘাটে বীরেন্‌বাবুর বাসাবাড়ীতে শয়ন করিয়া মনোরথে চড়িয়া কল্পনার কত রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত ধিক্কার, কত প্রতিশ্রুতি! কত গৃহত্যাগের বুদ্ধি—সন্ন্যাসের ছবি, কত হাহুতাশ, কত দীর্ঘনিঃশ্বাস! থাকিয়া থাকিয়া ছেলেমেয়ের স্নেহময় বদনকমলগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া পূর্ণ রাত্রির শেষভাগে একটী স্বপ্নদর্শন করিল। স্বপ্নদর্শনের পরই জাগিয়া বাড়ীর সকলকে অসময়ে জাগাইয়া বীরেন্ বাবুকে বলিল "বীরেন্, চল, আমি বাসায় যাইব !" বীরেন্ ত শুনিয়াই অবাক্ ! "সে কি কথা পূর্ণবাবু ! কাল এই ভাবে চলিয়া আসিলেন, আর রাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে সেইস্থানে যাইবার উদ্যোগ ! এ রহস্য ত বুঝিতে পারিতেছি না !"

বাসায় ফিরিবার ব্যস্ততায় পূর্ণ আর স্বপ্নের কথা বীরেন্‌বাবুকে বলিবার অবসর পাইল না। তাড়াতাড়ি

বাসায় আসিয়া উপরে গিয়াই মাখনকে বলিল "তোমরা যে, যে কাপড় পরিয়া আছ, সে সেই কাপড় পরিয়া এই বাড়ী হইতে চলিয়া যাও। আমি বাড়ীর মালিক, আমি বাড়ীতে থাকিব।" এই কথা বলিয়াই পূর্ণ নীচে চলিয়া আসিল। বীরেন্ বাবু ও গোপাল বাবু উপরে রহিলেন। আধ ঘণ্টা পরে ভুত্না ও ভেকা নীচে আসিয়া পূর্ণকে প্রণাম করিয়া খাওয়ার কথা বলিল। পূর্ণ সকলের সহিত ভাব করিয়া ফেলিল। শুধু ভাব নহে, যেন জীবনে কখনও অ-ভাব হয় নাই। মাখন ও ছেলেদের সহিত কেমন মেশামিশি, কেমন আদানপ্রদান! মাখন ভাবিল, "এ কি, কাল অমন করিয়া গালি দিয়া দূর করিয়া দিলাম, আজ বেহায়ার মত বিনা আহ্বানে ভোর না হইতে চলিয়া আসিয়াছে!" মাখনই জানে, তাহার কাছে এমন কি আছে, যাহার লোভে পূর্ণ এমন তাড়া খাইয়াও কুকুরের ন্যায় মাখনের অনুগমন করে! আবার মাখন হয় ত সন্দেহের দৃষ্টিতে কত কি মনে করিতেছে—"তবে কি আমাকে মিথ্যা আচরণ দেখাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছে? কোন গুঢ় স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য কি এত হীনতা বা সরলতা বা ক্ষমাশীলতা দেখাইতেছে?"

নালী ঘা

যে ঘার বাহিরে কোন ক্ষতের লক্ষণ থাকে না, অথচ ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া করে, তাহাকেই নালী ঘা বলে। এই ঘা দেহে হয়। মনুষ্যের মনেও নাকি ঘা হয়। তাহা চক্ষে দেখা যায় না, যাহার হয় সেই জানে ও বুঝে। কিংবা মনের ঘা অপরের নিকট কার্য্যে ধরা পড়ে। যে চতুর, সে সহজে মনের ঘা অপরকে দেখায় না। কিংবা তাহার মনে যে ঘা আছে, তাহা অপরকে জানিতে দেয় না। ইহাদের অপর নাম 'কপটী' বা ক্রূর। এই কপটীগুলি জগতের বহু অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে—সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও যথেষ্ট অনিষ্ট করে।

পূর্ণ একটু বোকা রকমের লোক—সরল, ক্ষমাশীল। তাহার মনে কখনও ঘা হয় নাই। যদি কখনও ঘা হয়, তাহা তখনই সারাইয়া ফেলে বা অপরকে দেখাইয়া ফেলে। এই তার স্বভাব। সুতরাং সে অপরের মনের ঘা সহজে জানিতে পারে না—বিশেষতঃ যাহারা ক্রূর, তাহারা ত পূর্ণের চক্ষে অতি সহজেই ধূলি দিতে পারে! মানব প্রায়ই 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'—নিজের আদর্শ বা ভাব দ্বারা জগৎকে বিচার করে। ইহা মানবপ্রকৃতির একটী বিশেষত্ব! এই হেতু পূর্ণ নিজে যেরূপ সরল ও

ক্ষমাশীল, অপরকেও তদ্রূপ মনে করে। তাহার ধারণায়ই আসে না, স্ত্রী পতিকে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করে কি করিয়া, পুত্র পিতাকে অমান্য করে কি করিয়া? পিতার অভাবে পুত্র নিশ্চিন্ত থাকে কি করিয়া? কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অকৃতজ্ঞতা উদ্‌গার করা যায় কি করিয়া? পূর্ণের জীবন ভরিয়া আমরা ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

পূর্ণের এই উদারতা ও সরলতার গুণে সে স্ত্রীর কয়েক বৎসরের দুর্ব্ব্যবহার বিশেষতঃ সেই দিনের অন্যায় উক্তি ভুলিয়া আবার মাখনের সঙ্গে ঘর করিতে লাগিল। এমন করিয়া কিছু দিন যায়, একদিন পূর্ণ নীচে বারিন্দায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে ভেকা প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া উপরে কাঁদিতেছে। পুত্রের দীর্ঘকাল একঘেয়ে ক্রন্দন শুনিয়া স্নেহশীল পিতা আর স্থির থাকিতে পারিল না। অমনি কারণ জানিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ভেকাকে ঘরে দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করায় ভেকা ক্রন্দনের ওকালতি করিয়া বলিল "আমি তোমার খাতা হইতে একখানি পাতা ছিঁড়িয়াছি, দাদা বলেন, আমি তাঁহার খাতা হইতে ছিঁড়িয়াছি। আমি বলি না, দাদা বলেন হাঁ, আমার কথা অবিশ্বাস করিয়া দাদা আমাকে মারিয়াছে

এইজন্য আমি কাঁদিতেছি।" পূর্ণ পুত্রকে বুঝাইয়া ক্রন্দন থামাইল। তখন মাখন ঘর হইতে ব্যঙ্গ করিয়া একটু ক্রোধ সহকারে বলিয়া উঠিল "ওটা কান্দুনে ছেলে, কাঁদাই ওর স্বভাব।" এই কথায় পূর্ণ বলিল "তুমি চুপ থাক। ওকে অমন করিয়া বিরক্ত করিও না।"

মাখন ক্রুদ্ধ হইয়া চেঁচাইয়া বলিল "কি! আমার ছেলেকে আমি বলিব না, তুমি বলিবে? একশবার বলিব। তুমি আমাকে নিষেধ করিবার কে? তোমার কথা আমি শুনিতে বাধ্য নহি।" মাখনের এই কথা শুনিয়া পূর্ণ উপরের পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাখনকে বলিল "তুমি চলিয়া যাও, আমি দরজা বন্ধ করিব।" স্বামীর এই কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া মাখন জেদ করিয়া সেই কবাটের চৌকাঠে নিজ দেহখানি বিস্তার করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল "দেখিত কে আমাকে এখান হইতে সরায়! এই আমি এখানে বসিলাম।" এই কথা শেষ করিতে না করিতে নিকটের বারিন্দা হইতে পূর্ণের ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া হঠাৎ বৃদ্ধ পিতাকে "এ পাগলামির জায়গা নয়" এই কথা বলিয়া তাঁহার কণ্ঠে চাপিয়া ধরিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া মেজেতে ফেলিয়া দিল। পূর্ণের পায়ের আঙ্গুলে ঘা ছিল, তাহাতে খুব ব্যথা লাগিল এবং

শরীরের অন্যান্য স্থানেও আঘাত লাগিল। এই ধাক্কা সামলাইয়া পূর্ণচন্দ্র উঠিয়া নিকটস্থ অত্যাচারী পুত্রকে এক চাপড় মারিয়া বলিল "দুষ্ট ছেলে, বুড়া বাপের গায়ে হাত !" আর যাইবে কোথায় ! উদ্ধত যুবক পুত্র তখনই আবার বৃদ্ধের 'টুটি' ধরিয়া তাহাকে পূর্ব্ববৎ চিৎ করিয়া ফেলিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইল। মাখন নকল কান্না কাঁদিয়া "ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, মানুষ ত মারা গেল; ছেড়ে দে" এইরূপ বলিতে লাগিল। বাহিরের লোক এই শব্দ শুনিয়া ধাইয়া উপরে আসিতে না আসিতে পুত্র গলা ছাড়িয়া দিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে রাস্তা হইতে লোক আসিয়া পূর্ণের অপূর্ণ ঘর পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ণ সকলকে ধন্যবাদের সহিত বিদায় দিয়া কবাট বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রে তাহার ভাগ্যে আর কিছু আহার জুটিল না।

শেষ চিকিৎসা

১৯২২ সনের ১০ই আগষ্ট রাত্রি আট ঘটিকায় পূর্ণ পুত্রের হস্তে গলাধাক্কা খাইয়া চিৎ হইয়া পড়ে। পূর্ণ সমস্ত রাত্রি ঘরে পড়িয়া পুত্রের ও স্ত্রীর ব্যবহারের বিষয় অনেক ভাবিল। প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল যাহাদের সঙ্গ করিয়াছে, হঠাৎ তাহাদিগকে ছাড়িতে তাহার কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমাগত কয়েক বৎসর যাবৎ এত ধাক্কা খাইয়াও পূর্ণ হজম করিয়াছে। এবারকার ধাক্কাও পূর্ণ হজম করিবার জন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া আরও দুই দিন সেই বাড়ীতেই বাস করিল। সে মনে করিল, রাগের মুখে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, একটু পরেই ক্ষমা চাহিবে। সংসারে থাকিলে এরূপ হইয়াই থাকে। ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ। দুই দিন অবলীলাক্রমে কাটিয়া গেল, মাখন বা চোকা—কেহই পূর্ণের নিকট তাহাদের অসদ্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা দূরে থাকুক, তাহার সহিত কোন ভদ্রব্যবহার পর্য্যন্ত করিল না। তখন পূর্ণ উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিয়া, চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ ১৩ই আগষ্ট সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া পাঁচ দিবস জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে বাস করিল। এবার পূর্ণ আর চাঁদনীঘাটের মত স্বপ্ন দর্শন করিল না। ১৮ই

আগষ্ট নবাবপুরে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

মাখন যে বাড়ীতে থাকে, তাহার জমিদার বাবু রেবতী মোহন দাসকে পূর্ণ তথায় থাকিতেই এক পত্র দিয়াছিল "আমি আমার স্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তাহাকে ত্যাগ করিলাম। আপনার বাড়ী আমি ছাড়িয়া দিলাম। অতঃপর বাড়ীর ভাড়া আমার নিকট পাইবেন না। আমার ত্যক্ত স্ত্রীর নিকট হইতে লইবেন।" ১৫ই তারিখে রেবতীবাবু পূর্ণকে উত্তরে জানাইলেন "যেহেতু আপনার স্ত্রী বাড়ীর ভাড়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার নিজ নামে উক্ত বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন, আমি ডাক্তার বাবুর নামেই বাড়ী ভাড়া দিলাম।" রেবতী বাবুর উত্তরে পূর্ণ পরিষ্কার বুঝিতে পারিল, অতঃপর তাহার সেই বাড়ীতে "প্রবেশ নিষেধ" হইল, যেহেতু বাড়ীর কর্ত্তা হইল ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র! পূর্ণ তথায় অনধিকার প্রবেশ করিয়া আর নূতন করিয়া গলাধাক্কা খাইতে সাহসী হইল না।

পূর্ণচন্দ্র নবাবপুরের বাড়ীতে একাকী বাস করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিকার্য্যে তাহার পুত্রকন্যাগুলির ছবি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ছোট

ছেলে ভেকাকে দেখিবার জন্য তাহার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যে পথে ভেকা স্কুলে যায়, পূর্ণ সেই পথে দাঁড়াইয়া থাকিত, এই বুঝি ভেকা আসে। এমন করিয়া একদিন দেখা পাইল। পুত্রকে দেখিয়া পিতার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইল। পূর্ণ ভেকাকে জিজ্ঞাসা করিল "ভেকু, তুই আমার সহিত দেখা করিতে আসিস্ না কেন ?" উত্তরে ভেকা কাতরভাবে বলিল "বাবা, তোমার জন্য আমার প্রাণটা কেমন কেমন করে ; সর্ব্বদাই তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মা আমাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এবং নেকা দাদা সঙ্গে আসিতে চাহে না। আমি একা কি করিয়া অত দূর যাইব ?" পূর্ণ সেই দিবসই নেকাকে একখানা পত্র দিল। উত্তরে নেকা জানাইল যে, সে পূর্ণচন্দ্রকে পিতা বলিয়া জানে না। এবং সে ত পূর্ণের নিকট আসিবেই না, ভেকাকেও আসিতে দিবে না।"

পূর্ণের প্রাচীন পিয়ন হরিহর ঠাকুর পূর্ব্ব 'নিমকের গুণে' পূর্ণের এই দুরবস্থায় তাহার সহিত আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিত এবং নানাপ্রকারে সেবা করিত। একদিন হরিহর আসিয়া পূর্ণকে সংবাদ দিল, "আজ সাতদিন হইল আপনার কন্যা তটিনী তাঁহার শিশু কন্যাকে লইয়া আপনার স্ত্রীর নিকট বাস করিতেছেন।" পূর্ণ তখন

বাতরোগে শয্যাগত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই কথা শুনিয়া সে স্নেহের দায়ে সমস্ত অপমান ভুলিয়া গিয়া তটিনী ও ভূত্নীকে দেখিবার জন্য অতিকষ্টে একখানি গাড়ী করিয়া মাখনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে যাইয়া সংবাদ পাইল, তটিনী, ভূত্নী, ভেকু কেহই তাহার সহিত দেখা করিবে না। পূর্ণ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। নবাবপুরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণ মাখনের নিকট একখানি কাকুতি-মিনতি করিয়া পত্র লিখিল এবং সে যেন দয়া করিয়া তটিনীর মেয়ে ও ভেকুকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। মাখন কোন উত্তরই দিল না।

৩০শে সেপ্টেম্বর বিজয়া দশমীর দিবস চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ণ এই পত্রখানি মাখনকে লিখিল :—

আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবা ও শ্রীমান্ শ্রীমতীদের প্রত্যেককে দিবা। পিতামাতা সংসারে পরম গুরু। ছেলেদিগকে এই শিক্ষাই দিও। আমরা আজ কাল রক্তের ও বংশের জাত ভাঙ্গিয়া যে নূতন 'টাকার জাত' গড়িয়া তুলিতেছি, ইহার পরিণাম বিষময়! আমি তাহাই ভোগ করিতেছি। পথে তাড়িত—স্নেহের ছেলেপেলে হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতেছি। ইহা কাহারও পক্ষে সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি সরলপ্রাণে আশীর্ব্বাদ করিলাম। ভালভাবে গ্রহণ করিও। আজ আমার জীবনে একটী নূতন দিন। ইতি "শ্রীপূর্ণচন্দ্র"

অরণ্যে রোদন

পূর্ণ বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদ কোথায় ছড়াইল ! উলু বনে মুক্তা ছড়াইল কি ? মাখন বিতাড়িত, অপমানিত বৃদ্ধ স্বামীর অযাচিত সরল শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল। নেকা যখন মাতাকর্ত্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, পূর্ণচন্দ্র তাহার পিতা নহে—এবং একদিন যখন মাখন নিজকে বিধবা বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করে নাই ; সুতরাং, আজ সে পূর্ণের অস্তিত্বই মানিল না। আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ক্ষমা বা কৃপা ভিক্ষা করা, নিজে যাইয়া স্বামীর চরণে পড়িয়া যাবতীয় অপরাধের জন্য অশ্রুপাত করা, পুত্রকন্যাগুলিকে পিতার চরণধূলিতে সিক্ত করা—ইহার কিছুই করিল না। পূর্ণের অত আগ্রহের শুভাশীর্ব্বাদ মাখন পদদলিত করিল।

৪ঠা অক্টোবর পূর্ণের নিকট তাহার এক বন্ধু সংবাদ আনিল, দশমীর দিবস তটিনীর একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে। সেই বন্ধু না বলিলে বোধহয় পূর্ণ এই সংবাদ জানিতেই পারিত না। পূর্ণ কন্যার ও স্ত্রীর ব্যবহার লক্ষ্য করিল।

২৪শে অক্টোবর পূর্ণচন্দ্র চট্টগ্রাম হইতে পুত্র সুরথ চন্দ্রের অনুরোধক্রমে মাখনের নিকট খুব মধুরভাবে ও

কাতরতা প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিল। কিন্তু মাখন সে পত্রের কোন উত্তর না দিয়া সুরথকে উত্তরে জানাইল "আমার পক্ষে স্বামীর সহিত মিত্রতা পুনঃ-সংস্থাপন করা অসম্ভব। আমি তাহাকে পত্রের উত্তর দিব না!"

চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৯ই নবেম্বর তারিখে কন্যা তটিনীকে স্নেহভরে পত্রদ্বারা তাহার নবাবপুরের বাড়ীতে আসিয়া ভাইভগিনীকে লইয়া চা পানের নিমন্ত্রণ করিল। শিক্ষিতা কন্যা চা পান করা দূরে থাকুক, পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত করিল না।

এক দিন পূর্ণচন্দ্র নবাবপুরের বাড়ীতে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, তাহার পালিত পুত্র কলি কন্যা তটিনীকে লইয়া গাড়ীতে ষ্টেসনের দিকে চলিয়াছে। গাড়ীর ছাদে পূর্ণের অতি প্রিয় বড় আয়নাখানি রহিয়াছে। এই দৃশ্যে পিতার চিত্তে কি ভাবের সমাবেশ হয়, তাহা কোন পিতাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

আজ ১৯২৩ সনের মার্চ্চ মাসের বার তারিখ। সাত মাস হইল পূর্ণ স্ত্রীপুত্রকন্যা-বিরহিত হইয়া নবাবপুরে একাকী বাস করিতেছে। পূর্ণ কি অরণ্যে রোদন করিয়াছে ও এক্ষণেও করিতেছে?

সপ্তম দর্শন

আগন্তুক

ঢাকার নবাবপুরস্থ যে প্রকাণ্ড বাড়ীতে "শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ" সংস্থাপিত, তাহারই নিম্নতলে "মনোমোহন প্রেস"। পূর্ণচন্দ্র নবাবপুরের যে বাড়ীতে একাকী বাস করে, এই মঠটী ঠিক তাহার বিপরীত দিকে অবস্থিত। একদিন প্রাতঃকালে পূর্ণচন্দ্র "আমার শেষ কাল" নামক একটী ক্ষুদ্র ইংরাজী প্রবন্ধ ছাপিবার জন্য সেই প্রেসে উপস্থিত। তথায় বসিয়া সে যখন তাহার প্রবন্ধের প্রুফ্ সংশোধন করিতেছিল, তাহার খানিকটা অপর এক ব্যক্তি শ্রবণ করিতেছিলেন।

প্রবন্ধের কয়েকটী বিস্ময়কর ঘটনা শ্রবণে আগন্তুকের চিত্তে স্বভাবতঃ কয়েকটী প্রশ্ন জাগিল। সুতরাং তিনি লৌকিকতার ও সামাজিকতার প্রচলিত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া, পূর্ণচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, আপনি প্রবন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন, সেই সমস্তই মিথ্যা। কেন না, আপনার ত স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, আপনার ত কেহই নাই, তবে আপনি আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির আপনার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের কথা

লিখিয়াছেন কেন ? আপনার নিজেরও ত কোন ক্লেশ, শোক, তাপ, অভাব কিছুই নাই, তবে আপনার এ প্রকার হাহুতাশ কেন ? আপনার ত বার্দ্ধক্যও নাই, তবে আপনি আপনার শেষকাল বলিতেছেন কেন ?" ইত্যাদি কতকগুলি কথা অযাচিতভাবে বলিয়া গেলেন। পূর্ণ বিস্মিত হইয়া আগন্তুকের মুখপানে চাহিয়া একদমে কথাগুলি শুনিল এবং মুখের উপরে এমন কতকগুলি বিপরীত ভাবের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল "মহাশয় ! আপনি কি বলিতে চাহেন, আমার এই সবই মিথ্যা ! আমি কি পাগল ? আমি কি পাগলামী ছাপাইতে আসিয়াছি ?" উত্তরে আগন্তুক বলিলেন "আপনার এই সব মিথ্যা কি না, আপনি পাগল কি না, এই সব কথার বিচার চান কি ?" "হাঁ, বিচার চাই বই কি ? আমি এই বৃদ্ধ বয়সে দারুণ মনঃকষ্টে দিনপাত করিতেছি, আর আপনি এক কথায় সেগুলি উড়াইয়া দিবেন—আমি তাহা শুনিব কেন ? আমি বিচার চাই।"

পূর্ণের এই উক্তি শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন "বেশ কথা, এই বিচারে কিছু সময়ের প্রয়োজন। আপনি সময় দিতে পারিবেন কি ?" "হাঁ, পারিব, আপনি যত সময় চাহেন, দিব এবং যদি আপনি যুক্তিপূর্ণ বিচার দ্বারা

আমার ভ্রম দেখাইতে পারেন, তবে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।" "আচ্ছা, আপনি কোন্ শাস্ত্রের বিচার গ্রহণ করিবেন? আপনি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' বিশ্বাস করেন?" আগন্তুকের এই কথার উত্তরে পূর্ণ বলিল, "হাঁ, আমি হিন্দুর ছেলে, আমি এই দুই শাস্ত্রের যুক্তি ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। কিন্তু ইহার বাহিরে কোন কথা গ্রহণ করিব না।"

—— ——

সদ্‌গুরু

সেই দিবস অপরাহ্নে পূর্ণচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে আগন্তুক পূর্ণের নবাবপুরের বাড়ীতে গীতা হস্তে উপস্থিত হইলেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে সাদরে আসনে বসাইয়া কালবিলম্ব না করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমার কষ্টের কথা আপনি জানেন? আপনারা সংসারত্যাগী লোক, মঠে থাকেন; আমরা সংসারী গৃহী, আমাদের যে অবস্থা, তাহা আপনারা বুঝিতে পারেন না। এই জন্যই আপনাদের সঙ্গে আমাদের বনিয়া উঠে না। আপনারা প্রথমেই বলিবেন "সংসার মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। এই যে

সংসার দেখিতেছ, ইহার কোন সত্ত্বাই নাই, কল্পনামাত্র। আমি ম'শায়, এই সব কথা মানিয়া লইতে রাজি নই। যদি আমার সকল কাহিনী শুনিয়া বিচার দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া আমার সংসার ও ক্লেশ দূর করিতে পারেন, তবে বলুন, নতুবা অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? আমি অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক শাস্ত্র শুনিয়াছি; কিন্তু আমার সংশয় দূর করিতে কেহই পারেন নাই। এইজন্য আমি আর কাহারও কথা শুনিতে ভালবাসি না। আচ্ছা, আপনি যখন নিজে যাচ্ঞা করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমার কাছে আসিয়াছেন, তখন আমি আপনার কথা কিছু শুনিব। আপনি বলুন।"

আগন্তুক—পূর্ণ বাবু, আপনি বলিলেন, 'আমার ক্লেশের কাহিনী অনেক।' আচ্ছা বলুন ত এই যে 'আমার' বলিলেন, এই 'আমি' কে?

পূর্ণ—কেন, এই যে আমি আপনার সম্মুখে বসিয়া আছি!

আঃ—তা হ'লে, এই দেহটাকে আপনি আমি বলিতেছেন?

পূঃ—হাঁ। তা বই কি? এ ছাড়া আবার আমি কে? এই 'আমি'রই ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা যতকিছু সব।

আঃ—আচ্ছা, এই 'আমি'টা জন্মে, কিছুকাল থাকে, পরে মরিয়া যায় বা বিনষ্ট হয় ?

পূঃ—হাঁ।

আঃ—আচ্ছা, আপনার 'আমি' সম্বন্ধে এই যে ধারণা, ইহা কি আপনার নিজের, না কোন সাধু বা শাস্ত্র হইতে পাইয়াছেন ? গীতা বা ভাগবতে এই সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিয়াছেন ? এবং সেই আলোচনা দ্বারা আপনার ধারণা সমর্থন করিতে পারিয়াছেন ?

পূর্ণ—হাঁ, ইহা আমার সাধারণ বিশ্বাস ; এই বিশ্বাসেই চলিতেছি। আমি যদিও খুব ভাল করিয়া গীতা বা ভাগবত পড়ি নাই, তবুও এইটুকু জানিয়াছি যে, এই 'দেহ'টা আমি নই। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিবার কালে প্রথমেই এই 'আমি'র কথা বলিয়াছেন। ভাগবতেও এই সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি। কিন্তু শুনিলে কি হইবে, তাহা কাণে লাগে না এবং কাজের বেলা মনে থাকে না। শোনা মাত্র সার।"

আঃ—আপনি কাহার নিকট গীতা বা ভাগবত শুনিয়াছেন ?

পূর্ণ—কেন ? ঢাকায় কলিকাতায় অনেক পাঠক ও বক্তার মুখে এই সব কথা শুনিয়াছি। তাঁহারা খুব

বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। দেশে সকলেই তাঁহাদিগকে বড় পাঠক ও বক্তা বলিয়া জানেন। বিশেষতঃ বড় বড় ধনীর বাড়ীতে এবং অনেক বড় বড় সভায় ইঁহাদিগকে দৈনিক প্রচুর অর্থ দিয়া আনা হয়। ইঁহারা খুব সুন্দরভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

আঃ—পূর্ণ বাবু! যদি আমাকে অভয় দেন, তবে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কেন না, আমি যাহা বলিব, শাস্ত্রের কথা, সত্য কথা; সুতরাং, সেই সত্য যদি আপনার এই চৌষট্টি বৎসরের শ্রুত বিষয়কে ধাক্কা মারে, তবে কিছু মনে করিবেন না। একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া নিরপেক্ষভাবে শ্রবণ করিবেন।

পূঃ—হাঁ, আমি নিশ্চয়ই শুনিব। আমি চিরকালই সত্যের জন্য লালায়িত। অসত্য বা কপটতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। অপ্রিয় হইলেও আপনি সত্যই বলিবেন।

আঃ—বেশ কথা। তাহা হইলে, আপনি যখন সেই পরম সত্য বস্তু যে ভগবান্, তাঁহার বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, আপনাকে তিনটী কার্য্য প্রথমেই করিতে হইবে—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা অর্থাৎ নিজের অর্জিত সকলপ্রকার বিদ্যার অভিমান বা অহঙ্কার তুচ্ছ বোধ করিয়া যাঁহার নিকট শ্রবণ করিবেন,

তাঁহাকে শ্রেষ্ঠবোধে নমস্কার করা, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ও অভ্রান্তজ্ঞানে, যতক্ষণ পর্যান্ত না সংশয় দূর হয়, ততক্ষণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা, এবং যাহা শুনা যাইবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা এবং সেই উপদেষ্টাকে ভৃত্যবৎ সেবা করা। আপনি গীতার আদেশ অনুসারে এই তিনটি কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন ?

পৃঃ—হাঁ প্রস্তুত আছি বটে ; কিন্তু যার তার কাছে মাথা নোয়াইব কি করিয়া এবং তিনি যে সব সৎ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই বা আমি বুঝিব কি করিয়া ?

আঃ—বেশ কথা বলিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে গীতা ও ভাগবত অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহার সার এই—যাঁহার নিকট শাস্ত্র শুনিতে হইবে, তিনি গুরু। এই গুরুর দুইটী লক্ষণ। যে সকল শাস্ত্রে ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির কথা আছে, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অভিজ্ঞ। এই গুণ থাকাতে তিনি শিষ্যের অর্থাৎ শ্রবণকারীর চিত্তের যাবতীয় সংশয় শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তি দ্বারা দূর করিতে সমর্থ হন। আর তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ। টাকাপয়সা, স্ত্রীলোক ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হন না। এইগুলিকে নিজ ভোগের জিনিষ মনে না করিয়া ভগবানের ভোগের জিনিষ বোধ

করেন। সুতরাং তাঁহার কামক্রোধাদি রিপু থাকে না! তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়জয়ী বা "গো-(ইন্দ্রিয়সমূহের) স্বামী"।

পূঃ—তবে এই যে সমাজে কত শত গুরু দেখিতে পাই, ইহারা কি গুরু নহেন? আচ্ছা, যে সকল গুরু-নামধারী নিরেট মূর্খ কিংবা দুষ্কার্য্যে রত, তাহাদিগকে বাদ দিলাম; কিন্তু এমন ত অনেক গুরু আছেন, যাঁহারা খুব বড় পণ্ডিত এবং যাঁহাদের স্বভাবচরিত্র ভাল। অবশ্য তাঁহারা দীক্ষা দিয়া কিংবা শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া বিষয়সম্পত্তির বৃদ্ধি এবং গৃহস্থালীও ভাল করিয়া করেন এবং নিজে খুব একটা বড় পণ্ডিত বা উচ্চকুলে জাত এরূপ প্রতিষ্ঠাস্থাপনে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তাহা হইলে কি ইঁহারা আপনার মতে গুরু নহেন?

আঃ—আবার আমার মতের কথা বলেন কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি নিজে মত প্রকাশ করিব না। কারণ, আমার মতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বঞ্চনেচ্ছা থাকিতে পারে। সুতরাং শাস্ত্রে কি বলিয়াছেন, শুনুন। যে সকল বাহিরের চিহ্ন বা লক্ষণ থাকিলে পশুকে গাভী বলা হয়, সেই সকল লক্ষণযুক্ত দুইটী পশু দুই ব্যক্তি ক্রয় করিয়া সেবা আরম্ভ করিল। একটী

কিছুকাল পরে বৎস প্রসব করিয়া পালককে দুগ্ধ দিতে লাগিল। অপরটী আদৌ বৎস প্রসব করিল না; সুতরাং পালকের ভাগ্যে একফোঁটা দুধও জুটিল না। শুধু শ্রমই সার হইল! গুরু সম্বন্ধেও শাস্ত্রে এই কথা বলিয়াছেন। যে সকল গুরুনামধারী শুধু পণ্ডিত বা উচ্চকূলে জাত, তাহাদিগকে বন্ধ্যা গাভীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট শাস্ত্রশ্রবণ বা দীক্ষা গ্রহণ করিলে কিংবা তাঁহাদের সেবা করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে না, কিংবা যথার্থ তত্ত্ব চিত্তে স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে না। শ্রবণ বা সেবা শুধু পণ্ডশ্রমেই পরিণত হইবে। শাস্ত্রে আরও বলিয়াছেন, ভগবান্ অকিঞ্চনের গোচর হন। অর্থাৎ যাঁহার জন্মের অভিমান, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, বিদ্যার অভিমান ও রূপের অভিমান নাই, যিনি নিজকে ভগবানের দাস বলিয়া বোধ করেন, তিনিই অকিঞ্চন। জগতে এমন কিছু নাই, যাহাকে তিনি নিজ বুদ্ধি করেন। যাহা কিছু সবই ভগবানের, এই বুদ্ধিতে বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখেন। এইরূপ যে অকিঞ্চন গুরু, তিনিই শাস্ত্রোপদেশ করিবেন, তিনিই শিষ্য করিবেন। যিনি শিষ্যকে সংসারে যাতায়াত হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে গুরু হইতে

নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই এইরূপ গুরু হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে। এই গুরুকে 'সদ্‌গুরু' বলা হইয়াছে।

পৃঃ—উত্তম কথা। কিন্তু এইরূপ 'সদ্‌গুরু' পাওয়া অসম্ভব।

আঃ—তা' হ'লে, ভগবৎপ্রাপ্তিও অসম্ভব। যেহেতু, ভগবান্ ও সদ্‌গুরু একই জিনিষ। জীব যখন আপনার ন্যায় সংসারসাগরে হাবুডুবু খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, নিজকে আর ভাসাইয়া রাখিতে পারে না, কিংবা জীব যখন বুঝিতে পারে, দুঃখকে দূরে রাখিয়া সুখ লাভ করিবার জন্য সে বিবাহ, অর্থোপার্জ্জন, গৃহাদি নির্ম্মাণ, সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছে, সেই সমুদয় তাহাকে কোনপ্রকারে প্রীতি দিতে পারে না এবং সেই সমুদয় অনিত্য, তাহার সঙ্গে নিত্যকাল থাকে না; তখন, নির্ব্বেদ বলিয়া তাহার একটা অবস্থা হয়। অর্থাৎ তখন সে আত্মীয়স্বজন, বিত্ত, গৃহ, অপত্য ইত্যাদির প্রতি চাহিয়া দেখে, ইহারা তাহার সঙ্গের সঙ্গী নহে—কেবল স্বার্থের জন্য সাময়িক ভালবাসা দেখাইতেছে মাত্র, তখন সে যথার্থই ব্যাকুলভাবে ভগবানের নিকট কাঁদিয়া বলে—

"ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে আসিয়াছি আমি
বলিব দুঃখের কথা॥
জননীজঠরে ছিলাম যখন
বিষম বন্ধনপাশে।
একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল পড়ি মায়াজালে
না হইল জ্ঞান-লব॥
আদরের ছেলে স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল॥

আবার বাল্যের কথা স্মরণ করিয়া বলে—

ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল
পাঠ পড়ি অহরহঃ॥

বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন করি এক মনে
ভুলিনু তোমারে হরি॥
বার্দ্ধক্যে এখন এ অধম দাস
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল
এখন কি হবে গতি॥
বিদ্যার বিলাসে কাটাইনু কাল
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ না ভজিনু কভু
এখন শরণ তুমি॥

জড়বিদ্যার জন্য পণ্ডশ্রম করিয়াছে ভাবিয়া বলে—

পড়িতে পড়িতে ভরসা বাড়িল
জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল সে জ্ঞান দুর্ব্বল
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি॥
জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥

সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন শক্তির অভাবে
কিছু নাহি লাগে ভাল ॥

যাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ব্যবহার স্মরণ করিয়া বলে—

যৌবনে যখন ধন উপার্জ্জনে
হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া গৃহিণীর কর
ধরিনু তখন আমি ॥
সংসার পা'তা'য়ে তাহার সহিত
কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুতসুতা জনম লভিল
মরমে হইনু হত ॥
সংসারের ভার বাড়ে দিনে দিনে
অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া ঘেরিল আমারে
অস্থির হইল মতি ॥
সংসার-তটিনী- স্রোত নহে শেষ
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়
এ আশা বিফল মোর ॥

আত্মপরীক্ষা করিয়া বলে—

আমার জীবন সদা পাপে রত
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যাভাষী
পর দুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা বিষয়ে মোহিত
হিংসাগর্ব্ববিভূষণ॥
প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি চরণে শরণ
তোমার করিনু সার॥
করম গেয়ান কিছু নাহি মোর
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময় আমি ত কাঙ্গাল
অহৈতুকী কৃপা চাই॥

তখন জীব সদ্‌গুরুরূপে ভগবানের সাক্ষাৎ পায়। যাঁহারা

নিজের বুদ্ধি দ্বারা বা বিচার করিয়া, নানাতীর্থ ঘুরিয়া, বনজঙ্গল খুঁজিয়া সদ্‌গুরু বাহির করিতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ভগবান্ যখন কৃপা করেন, তখনই জীব সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পান। ভগবান্ ও গুরু তত্ত্বতঃ একই বস্তু। ভগবানের স্বীয় যে শক্তিবলে তিনি নিজেই নিজকে নিত্যকাল সেবা করেন, সেই শক্তিই গুরুদেব। একই বস্তু সেব্য ও সেবকরূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং গুরুকে একটা মানুষ বুদ্ধি করা বা গুরুর জন্মমৃত্যু কল্পনা করা সঙ্গত নহে। ইহা গুরুবুদ্ধি নহে, লঘুবুদ্ধি। গুরুবস্তুকে লঘুবুদ্ধি করা অন্যায়।

পূঃ—তা হ'লে, আপনি ত সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছেন। আমাকে সেই সদ্‌গুরু দেখাইয়া দিতে পারেন ?

আঃ—আমি সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছি কিনা সে কথা আমি বলিতে চাহি না। আপনি পরের মুখে ঝাল খাইবেন কেন ? আমি ত আপনাকে প্রতারণা করিতে পারি। তবে যদি আপনি ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে একজন সাধুপুরুষের নিকট লইয়া যাইতে পারি, আপনার যদি সৌভাগ্য থাকে, এবং সত্যই যদি আপনার বিষয়রোগের চিকিৎসা করাইবার বুদ্ধি আসিয়া থাকে, তবে হয়ত আপনার সদ্‌গুরু লাভ হইয়া যাইতে পারে।

অষ্টম দর্শন

শ্রীমায়াপুর

'কৃষ্ণনগর সিটী' ষ্টেসনে পৌঁছিয়াই পূর্ণচন্দ্র সেই আগন্তুককে বলিতে লাগিল "প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই কৃষ্ণনগরে ছাত্ররূপে কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছি। আবার এই সুদীর্ঘকাল পরে এখানে আসিলাম। এই সময়ে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার নিজের এই দেহটার দিকে চাহিলেও কত পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। যৌবনের চিত্তের অবস্থা আর বার্দ্ধক্যের চিত্তের অবস্থা, এই দুই-এ কত পার্থক্য !" এই কথা শেষ করিতে না করিতে মোটরগাড়ী কৃষ্ণনগর কলেজের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তখন পূর্ণের নিকট তাহা ছবির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই কলেজগৃহে পূর্ণ এফ্, এ, পড়িত। দেখিতে দেখিতে মোটরগাড়ী সাত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া স্বরূপগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। সম্মুখে 'খড়ো' বা সরস্বতী নদী। নৌকাযোগে সরস্বতী পার হইয়া অপর পারে পৌঁছিয়াই বামে দেখিল সহর নবদ্বীপের ঘরবাড়ীগুলি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সহরের সম্মুখে অনেকটা বালুকার চড়া, তৎপর গঙ্গা

প্রবাহিতা। গঙ্গাকে বামে রাখিয়া আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া পূর্ণ মায়াপুর-অভিমুখে যাত্রা করিল।

এক ক্রোশ যাইতে না যাইতে পূর্ণচন্দ্র দেখিল, সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত এক উচ্চ ভূখণ্ড। উপরে উঠিবার নিমিত্ত সিঁড়ি। তখনই সহযাত্রী আগন্তুক সেই সিঁড়িব সম্মুখে দণ্ডবৎ হইল এবং পূর্ণচন্দ্রকে বলিল "এই সেই চিরপবিত্র মহাযোগপীঠ, যেস্থানে শ্রীচৈতন্যদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সেই প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর।" এবং পূর্ণচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীলক্ষ্মী দেবী এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভুবনমনোমোহন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে নিম্ববৃক্ষমূলে 'নিমাই' অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই নিম্ববৃক্ষসম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জীবন ধন্য করিলেন। পূর্ণের বহুদিনের বাসনা আজ চরিতার্থ হইল। আজ ৪৩৬ বৎসর চলিয়া গেল, গঙ্গার কুটীল গতিতে কত ভূমিখণ্ড অতলসলিলগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কত নবনব ভূখণ্ড জলরাশি বিদীর্ণ করিয়া স্বীয় বক্ষোদেশ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই ভূখণ্ড আজও একই অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবের পদরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। সেই পুরাতন নিম্ববৃক্ষটীর মূলদেশ হইতে একটী নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হইয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র শ্রীমন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরে বসিয়া নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যে সাধু পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পূর্ণচন্দ্রের এস্থানে আগমন, তিনি তৎপূর্ব্বদিবস সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ কৃষ্ণনগরেই পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে নিরুৎসাহ না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি দর্শন করিবার মানসে আগমন করিয়াছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, যখন পূর্ণচন্দ্র পুনরায় কলিকাতা যাইবার জন্য শ্রীমন্দিরের সেবকের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল, তখন শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী আসিয়া পূর্ণচন্দ্রকে বিশ্রাম লাভ এবং স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিবার জন্য সাদরে ও বিনীতভাবে অনুরোধ করায়, সে সম্মত হইল। মধ্যাহ্নে প্রসাদসেবন ও অপরাহ্নে বল্লালদীঘি, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, চাঁদ কাজির সমাধি (যে কাজিকে শ্রীচৈতন্যদেব হরিনামদানে উদ্ধার করিয়াছিলেন), বল্লান সেনের রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ইত্যাদি দর্শন করিয়া পূর্ণচন্দ্র আগন্তুক সহ কলিকাতায় যাত্রা করিল।

গৌড়ীয় মঠে

পর দিবস সন্ধ্যাকালে পূর্ণচন্দ্র কলিকাতা 'গৌড়ীয় মঠে' আগন্তুক সহ উপস্থিত হইয়া সেই সাধু পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিল। পূর্ণ সন্ন্যাসীর বেশধারী সেই সৌম্য মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইল। ইঁহার নাম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদ। ইনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। বর্ত্তমান বয়স ৪৮ বৎসর। আগন্তুক পূর্ণচন্দ্রকে পরমহংস প্রভুপাদের নিকট পরিচিত করাইবার পর, পূর্ণ করজোড়ে কাতরভাবে নিবেদন করিল "প্রভো, আমি সংসারে কাহারও অপকার করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বরং সর্ব্বদাই সকলের উপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুত্রগণকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছি, মেয়েকে বি, এ পর্য্যন্ত পড়াইয়াছি। একটী অনাথ বালককে বাল্যাবস্থা হইতে বিলাতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছি। স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি প্রীতি ও স্নেহদান করিয়াছি। ভ্রাতৃবর্গকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমার এক্ষণে চৌষট্টি বৎসর বয়স। গবর্ণমেণ্টের পেন্‌সন্ পাই। কিন্তু এই বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি একাকী একটী বাড়ীতে পড়িয়া আছি। কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। আমি আত্মীয়স্বজনের বর্ত্তমান ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া যার পর নাই মনঃকষ্টে দিনপাত করিতেছি। সংসারে এমন বান্ধব পাই না, যে আমাকে এই মানসিক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে; কিংবা এমন স্থান দেখি না, যেখানে গেলে আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে। আপনি সাধু, মহাপুরুষ, আমি আপনার নিকট আমার এই ক্লেশ নিবারণের উপায় জানিবার জন্য আসিয়াছি। আপনি এমন শক্তি দান করুন, যাহাতে এই ক্লেশের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি।"

গোস্বামিপাদ যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—আপনি মুক্ত, আপনার ত কোন ক্লেশ নাই। আপনি মহা ভাগ্যবান্। আপনার ন্যায় ভাগ্য আমাদের কবে হইবে। জীবগণ মুক্ত হইবার জন্য যে কার্য্যের প্রয়াস করে, তাহা আপনার স্বতঃই হইয়াছে। ভগবান্ আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন। কারণ তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন 'আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করি এবং তাহাকে এমন অবস্থায় ফেলি, যেন আত্মীয়বর্গ আপনা হইতে তাহাকে পরিত্যাগ করে।' সুতরাং, আপনি

আপনার অবস্থার প্রতি দোষারোপ না করিয়া বরং উহা প্রাপ্তিতে খুব আনন্দ প্রকাশ করুন। কারণ, ভগবানের এইপ্রকার অযাচিত কৃপা আপনি পাইয়াছেন !

কাহার রাজত্ব ?

পূর্ণচন্দ্র, গোস্বামিপ্রভুর উক্তিসমূহ শুনিয়া প্রথমতঃ একটু বিরক্ত ও বিস্মিত হইল। কারণ, সেই আগন্তুকও তাহার সহিত প্রথমেই এইজাতীয় উক্তি করিয়াছিলেন। উভয়ের কথারই এক সুর—এক ভাব—এক উদ্দেশ্য। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পূর্ণচন্দ্র উক্তির যুক্তি শাস্ত্রের বিচার সহ শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু গ্রহণ করিতে পারিল না। রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর এক দিবস আসিয়া আরও কথা শুনিয়া যাইবে বলিয়া পূর্ণ সে রাত্রিতে তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল এবং ট্রামে পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের হাবড়ার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুক সেই মঠেই থাকিয়া গেলেন।

দুই তিন দিবস চলিয়া গেল, পূর্ণ আর আসে না। আগন্তুক তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া হাবড়ায় অনুসন্ধান

করিয়া জানিলেন, পূর্ণ কাশী চলিয়া গিয়াছে। তখন আগন্তুক পুনরায় ঢাকা মঠে চলিয়া আসিলেন।

পূর্ণ কাশী গিয়াছে—চিত্তের জ্বালা জুড়াইতে! তীর্থস্থানে গেলে নাকি চিত্তের জ্বালা জুড়ায়! কিংবা তথায় এমন কোন সন্ন্যাসী মিলিয়া যাইবে, যিনি কোন কুহকে বা ঔষধে তাহার চিত্তের ব্যাধি সারাইয়া দিতে পারেন।

কয়েক দিবস পরে ঢাকায় পূর্ণের সঙ্গে আগন্তুকের পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিল। তখন আগন্তুক পূর্ণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পূর্ণের চিত্তের ব্যাধি কমে নাই। জ্বালা যেমনি ছিল, তেমনই আছে। তখন একথার সেকথার পর আগন্তুক বলিতে লাগিলেন "আপনি কোন্ সময়ে কাহার রাজত্বে বাস করিতেছেন জানেন?

পূর্ণ—কেন? ১৯২২ সাল, ইংরাজ-রাজত্ব!

আগন্তুক—পূর্ণবাবু, না। ইহা ১৯২২ সালও নহে, ইংরাজ-রাজত্বও নহে। এইটী কলিকাল, ইহা কলির রাজত্ব!

পূর্ণ—ওঃ ঠিক বলিয়াছেন, কলি-কালই ত বটে। কিন্তু কলির রাজত্ব বলিলেন কেন, উহা ত বুঝিলাম না।

আগন্তুক—প্রায় পাঁচহাজার বৎসর হইল, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের কথা গীতা ও ভাগবতে লিখিত হইয়াছে এই ভাগবত গ্রন্থে কলির রাজত্ব ও কলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা শুনিলে আপনি বিস্মিত হইবেন, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই বিংশ শতাব্দীর জীবের ব্যবহার, চিত্তের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে কেমন নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ, এই কলিকাহিনী শ্রবণ করিলে আপনি দেখিবেন, সত্যই আপনি কলির রাজত্বে বাস ও কলির মাহাত্ম্য অনুভব করিতেছেন। যদি আপনি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া শ্রবণ করেন, তবে আপনার হিত বই অহিত হইবে না।

তুই কে ?

অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটী গাভী ও একটী বৃষ অত্যন্ত বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন উহাদের পালক বা রক্ষক কেহই নাই। রাজার মত দেখিতে একজন শূদ্র দণ্ড লইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতেছিল। বৃষটী মৃণালের ন্যায় ধব্ধবে শাদা,

তাহাতে দণ্ডের আঘাতে যেন রক্ত ফুটিয়া উঠিতেছিল। বৃষটী একপায়ে দাঁড়াইয়া লাঠির আঘাত কাতরভাবে সহ্য করিতেছে, থর থর কাঁপিতেছে এবং মূত্রত্যাগ করিতেছে। গাভীটিও যেন বৎসহারা হইয়া সেই শূদ্রের প্রহারে কাঁদিতেছিল এবং ক্লেশে ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া যেন কিছু খাদ্য ভিক্ষা করিতেছিল।

রাজা পরীক্ষিৎ সেই গাভী ও বৃষকে এই অবস্থায় দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধের সাজসজ্জা পরিয়া ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া ক্রোধের সহিত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরে তুই কে ? তোকে নটের ন্যায় রাজার পোষাকে আবৃত দেখায় বটে, কিন্তু তোর কার্য্য শূদ্রের ন্যায় ! আমার রাজ্যে তুই কোন্ সাহসে এই দুর্ব্বল পশুদিগকে প্রহার করিতেছিস্ ? তুই অত্যন্ত অপরাধী, তোর অপরাধের শাস্তি তোকে এক্ষণেই ভোগ করিতে হইবে।"

এই বলিয়া সেই বৃষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে তুমিই বা কে ? তোমার মৃণালের মত এমন সুন্দর শাদা রঙ্। চতুষ্পদ হইয়াও তোমার তিনটী পা নাই, শুধু এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছ ! তুমি কি কোন মায়াবী, কি কোন দেবতা আমার সহিত ছলনা করিতেছ ?

আমাদিগের রাজত্বে কেহ অশ্রুপাত করে না—তোমাকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। তোমার অপর পা তিনটী কে ছেদন করিয়াছে?” তিনি গাভীকেও নানাপ্রকারে আশ্বাস দিয়া ক্রন্দন থামাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন “মা, আপনি কাঁদিবেন না। পৃথিবীতে এমন কে আছে, আমার হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকিতে আপনার চক্ষে অশ্রু বহাইবে? আমি খলজনের শাসনকর্ত্তা। আপনার উপকার ছাড়া, আমার নিজের হিতের জন্যও এই দুরাত্মার প্রাণ সংহার করিব। কেন না, যাহারা আর্ত্ত, তাহাদের আর্ত্তি দূর করাই রাজার কর্ত্তব্য।”

বৃষকে লক্ষ্য করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন “হে বৃষ, তুমি সাধু ও নিরপরাধ। যে দুষ্ট নিরপরাধ ব্যক্তিকে দুঃখ দেয়, আমি সর্ব্বদাই তাহার ভয়ের কারণ হইয়া থাকি। যে সকল অধার্ম্মিক ব্যক্তি অনাপৎকালে বিপথগামী হয়, আমি তাহাদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টের পালন করি।”

রাজা পরীক্ষিতের এই সকল কথা শুনিয়া বৃষরূপী ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন, “হে মহারাজ! আর্ত্তজনের প্রতি এইপ্রকার অভয়দান আপনাদেরই উচিত বটে। প্রাণীদিগের ক্লেশের হেতু কোন্ পুরুষ হইতে হইতেছে,

আমি তাহা জানিতে পারি নাই।” ইহা শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন “হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আপনার ঘাতককে জানিয়াও তাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছ না। ইহাতে বোধ হয় তুমিই ধর্ম্ম, বৃষরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছ। শাস্ত্রে বলেন, ঘাতককে জানিলেও প্রকাশ করিবে না, কারণ অধর্ম্মকারীর যে গতি, সূচনাকারীরও সেইপ্রকার গতি হইয়া থাকে। হে ধর্ম্ম! সত্যযুগে (১) তপস্যা (২) শৌচ, (৩) দয়া ও (৪) সত্য এই চারিটী দ্বারা তোমার পদ সম্পূর্ণ ছিল। বোধ হয়, কলির প্রভাবে গর্ব্ব, স্ত্রীতে আসক্তি এবং মদ্যপানজনিত মত্ততা এই তিন অধর্ম্মাংশ দ্বারা তোমার তিনটী পদ ভগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে কলিযুগে তোমার একপাদ (চতুর্থাংশ) সত্য মাত্র আছে। তাহাতেই তুমি কোনক্রমে আত্মধারণ করিয়া আছ। কিন্তু এই অধর্ম্মস্বরূপ কলি অসত্যদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তোমার এই পদটীও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।” রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে বৃষরূপী ধর্ম্মকে এবং গাভীরূপিণী পৃথিবীকে সান্ত্বনা করিয়া অধর্ম্মের হেতু যে কলি, তাহার প্রাণসংহারের জন্য খড়গ ধারণ করিলেন।

রাজা খড়গদ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া কলি ভয়ে বিহ্বল হইল এবং রাজচিহ্ন

পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজের পদতলে গিয়া পড়িল। তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং দীনবৎসল ছিলেন। নিজ চরণতলে পতিত কলিকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল এবং আশ্রিতজনকে বধ করিলে অকীর্ত্তি হইবে ভাবিয়া কলির প্রাণসংহারে বিরত হইয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন "আমরা মহাবীর অর্জ্জুনের যশ ধারণ করি। তুমি আমাদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছ। তোমাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু তুমি অধর্ম্মের পরম মিত্র; সুতরাং আমার রাজ্যের কোথায়ও তুমি থাকিতে পারিবে না। তুমি রাজদেহে থাকিলে, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুর্জ্জনতা স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী কপটতা, কলহ, দম্ভ ইত্যাদি অধর্ম্ম সমূহ বিরাজ করিবে। সুতরাং, তুমি আমার রাজত্ব ছাড়িয়া চলিয়া যাও। আমার রাজত্বে সকলে বিষ্ণুরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে, এইস্থানে ধর্ম্ম ও সত্যেরই বর্ত্তমান থাকা উচিত।"

মহারাজ পরীক্ষিতের এই আদেশ শুনিয়া কলি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল 'মহারাজ! আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যেখানেই বাস করি না কেন, সেই স্থানেই আপনাকে এইরূপ ধনুর্ব্বাণধারী অবস্থায়

আমার প্রতি শাস্তার ভাবে দেখিতে হইবে। ইহা আমি পারিব না। অতএব হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! দয়া করিয়া আমাকে এমন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন, যেখানে সুস্থির থাকিয়া আপনার শাসন পালন করিতে পারি।”

কলির কাতর প্রার্থনায় রাজা পরীক্ষিৎ তাহার বাসের জন্য দ্যূতক্রীড়া (অর্থাৎ তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি খেলা) মদ্যাদি পান (পান, তামাক, চা, মদ্য ইত্যাদি নেশার জিনিষ খাওয়া), স্ত্রী এবং হিংসা, (প্রাণিবধ, অপর প্রাণীকে উদ্বেগ বা ক্লেশ দেওয়া ইত্যাদি) এই চারিটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দ্যূতে মিথ্যা, মদ্যাদি পানে তপোনাশ, স্ত্রীতে শৌচনাশ, হিংসায় ক্রূরতাজনিত দয়ানাশ জন্মিবে। কলি এই কয়েকটী স্থানে বাসের অনুমতি পাইয়াও সন্তুষ্ট হইল না! পুনরায় যাচ্ঞা করায়, রাজা কলিকে বাসের জন্য সুবর্ণও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং পরে অসত্য, মদ, কাম, হিংসা ও বৈর এই পাঁচটী বস্তুও দিলেন। সুতরাং কলি এই সকল স্থানে বাস করিতে লাগিল।

কলির মাহাত্ম্য

আগন্তুকের নিকট 'কলির রাজত্ব' শুনিয়া পূর্ণের অনেক কথা মনে উদিত হইল। বিশেষতঃ সে যে কলিকে দুধভাতে পুষ্ট করিয়াছে, তাহার সহিত এই কলির কোথায় সামঞ্জস্য, তাহা সে সঙ্গে সঙ্গেই মানস চক্ষুতে দেখিতে লাগিল। আগন্তুক পূর্ণের মুখভঙ্গিতে এই ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। কারণ, শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মানবান্তঃকরণে যে সব ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা বদনমণ্ডলে বিকশিত হয়। তখন পূর্ণচন্দ্র কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ত কলির পরিচয় ও বাসস্থানের কথা বর্ণন করিলেন। কলি তথায় থাকিয়া কি করিতে লাগিল ?"

আগন্তুক বলিতে লাগিলেন :—"কলি স্বীয় সুন্দর বাসস্থান পাইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার প্রভাব চারিদিকে বিস্তার লাভ করিল। প্রতিদিন ক্রমশঃ লোকের ধর্ম্ম, সত্য, শুচিতা, দয়া, ক্ষমা, আয়ুঃ, বল ও স্মৃতি নষ্ট হইতে লাগিল। মনুষ্যের জন্ম, আচার, ও গুণাদি সমুদয় কেবল ধনসংখ্যার উপর নির্ভর করিতে লাগিল। ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে বলমাত্র কারণ হইল।

"ভার্য্যা পতিকে রুচির সামগ্রী মনে করিল। কুল ও গোত্রের বিচার লোপ পাইল। ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি

ব্যবহারিক বিষয়ে প্রবঞ্চনা চলিল। স্ত্রীপুরুষের রতিমাত্র ও ব্রাহ্মণদিগের সূত্রধারণমাত্র শ্রেষ্ঠতার কারণ হইল।

"প্রজাগণের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাহারা রাজস্ব দিতে না পারিয়া রাজার উৎপীড়নে শাক, মূল, ফল, পুষ্প, বীজ খাইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিতে শস্যের হানি জন্মিল। তাহারা শীত, বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রবে, পরস্পরের সহিত কলহে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও ব্যাধিতে অত্যন্ত তাপ পাইতে লাগিল। চৌর্য্য, মিথ্যা, বৃথাহিংসা মানুষের বৃত্তি হইয়া উঠিল।

"লোক সকল মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয় ও দারিদ্র্য প্রভৃতি বিষয়ে অনুরক্ত হইল। তাহারা মন্দবুদ্ধি, অল্পভাগ্য, বহুভোজী, ধনহীন ও কামী হইল। স্ত্রীসকল স্বেচ্ছাচারিণী, অসতী হইতে লাগিল। জনপদসকল দস্যুসমূহ দ্বারা আক্রান্ত, বেদসকল পাষণ্ড লোক দ্বারা দূষিত এবং ব্রাহ্মণেরা কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ হইল। স্ত্রীলোকসকল ক্ষুদ্রকায়া অথচ বহুভোজিনী ও বহুপুত্রা, নির্লজ্জা, সর্ব্বদা কটুভাষিণী এবং চৌর্য্য ও মায়া বিষয়ে অত্যন্ত সাহসসম্পন্না হইল। ধনহীন প্রবঞ্চক বণিক্‌সকল ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহার আরম্ভ

করিল, সাধারণ লোক আপদ্ ভিন্ন সময়েও সাধুঘৃণিত ব্যবহারকেও বহুমানন, ভৃত্যেরা অখিলগুণসম্পন্ন প্রভুকে নির্ধন দেখিলেই পরিত্যাগ এবং প্রভুরাও কুলপরম্পরাগত ভৃত্যকে বিপন্ন দেখিয়া ত্যাগ করিতে লাগিল। গাভী প্রাচীন হইলেই তাহাতে অনাদর, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ, কেবল ভোগের জন্য সৌহৃদ্য করা, ননন্দা, শ্যালকাদির সহিত মন্ত্রণা, এবং দরিদ্র ও স্ত্রৈণ হওয়া এই সকল কার্য্য চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

"কলির প্রজারা বসন, অন্ন, জল, শস্য, স্নান ও অলঙ্কারাদির অভাবে অতি কুৎসিত, দেখিতে পিশাচের ন্যায় আকার ধারণ করিতে লাগিল। সামান্য অর্থের জন্য দীর্ঘকালের সৌহৃদ্য ত্যাগ, স্বীয় প্রিয় প্রাণ ও স্বজনগণকে বধ করিতে কেহ কুণ্ঠা বোধ করে না। বৃদ্ধ মাতাপিতাকে সেবাশুশ্রূষার ভয়ে এবং শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া পুত্র ও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করা পুরুষের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল।"

উপায় ?

'কলির রাজত্ব' শ্রবণে পূর্ণের চিত্তে যে সকল ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল, 'কলির মাহাত্ম্য' শ্রবণে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। পূর্ণচন্দ্র একে একে সকল কথা মিলাইয়া দেখিল, সে সত্যই কলির রাজত্বে বাস এবং কলির মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছে। তখন তাহার বদনে ভীতি ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হইল। কিছুক্ষণ এইভাবে বিমর্ষ, ভীত ও নিরাশ থাকিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি সংসারটা এই ভাবেই চলিতে থাকিবে ? কলির কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার কি কোন উপায় নাই ?"

আগন্তুক :—হাঁ, আছে বই কি ? কলির এত প্রভাব, এত দৌরাত্ম্য থাকিলেও এবং মানুষ এই সকল দোষসম্পন্ন হইলেও, কলির রাজত্বে একটি খুব বড় সুবিধাও আছে। জগতে ভালমন্দ দুই-ই আছে। সুতরাং কলিকালে এতগুলি খারাপ জিনিষ থাকিলেও, একটি পরম উপাদেয় জিনিষও আছে।

পূর্ণ :—সেটী কি ? দয়া করিয়া বলুন।

আগন্তুক :—প্রতি যুগেই এইজাতীয় অসুবিধা অল্পাধিক পরিমাণে ছিল। কিন্তু কলিকালে সেগুলি

অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ভগবান্‌কে ভুলিয়া বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে বদ্ধ বলে। এই বদ্ধ জীবের মুক্তি লাভের অর্থাৎ বিষয় ভোগের বুদ্ধিত্যাগের উপায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্নপ্রকার ছিল। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা দ্বারা বদ্ধ জীব মুক্ত হইত। কিন্তু কলিকালে এই সকল সাধন সহজসাধ্য নহে বলিয়া কলির প্রকোপ হইতে মুক্তি লাভের উপায় কেবল হরিকীর্ত্তন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ম্রিয়মাণ আতুর ব্যক্তি শয্যায় পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অবশতা জন্য স্খলিতবাক্য হইয়াও ভগবানের নামগ্রহণ করিলে ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরুষোত্তম ভগবানের নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, বা স্মরণ করিলে কিংবা তাঁহাকে পূজা করিলে সহস্র সহস্র জন্মের অশুভ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই শ্লোকটী বোধ হয় আপনি জানেন

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥'

অর্থাৎ কলিকালে হরিনাম হরিনাম হরিনামই জীবের একমাত্র গতি, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।

নবম দর্শন

শনির দশা

"এ কি, পূর্ণবাবু, আপনাকে যেন একটু বিমর্ষ দেখ্‌ছি !" আগন্তুক এক দিন পূর্ণচন্দ্রকে তাহার বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ণ উত্তর করিল "না, বিমর্ষ কেন হ'ব ? তবে কিনা, কাল আমার বালিশের নীচ হইতে কে আমার 'মানিব্যাগটী' লইয়া গিয়াছে। উহাতে চারিখানা গিনি, একখানা দশ টাকার নোট ও খুচ্‌রা ছয়টী টাকা ছিল। আমার নিকট খুচ্‌রা আর কিছুই নাই ! এজন্য একটু ভাবিতেছিলাম। নতুবা টাকার জন্য কিছুই ভাবি না। ভাবিয়াই বা কি করিব ! যতদিন শনির দশা আছে, ততদিন আমার এই দুরবস্থা চলিবে। চারিদিকে এইরূপ লোকসান !"

আগন্তুক—পূর্ণবাবু ! আপনি দেখিতেছি শনি রাহুকে বেশ মানেন। আচ্ছা, এইসকল সুখদুঃখের কারণ কি বুধ শনি প্রভৃতি গ্রহ ? তাহা হইলে, তাহাদের সন্তোষ বিধান করিলেই ত আপনার দুঃখ আর থাকে না ! এবং জগতে দুঃখ বলিয়া একটা জিনিষও আর থাকে না ! আপনি তাহা করেন না কেন ?

পূর্ণ—হাঁ, এই কথা বিশ্বাস করি, করি-ও না। এ বিষয়ে আপনার মত কি ?

আগন্তুক—পূর্ণবাবু ! আমি প্রথম হইতে আপনাকে বলিয়া রাখিয়াছি, আমি কোন মন-গড়া কথা বলিব না। আচ্ছা, আপনি যদি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "অবন্তীভিক্ষুর" কাহিনী শুনেন, তবে আপনার এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পাইবেন। আমাদের সুখ দুঃখ আছে কি না ? ইহাদের কারণ কি ? স্রষ্টা কে ? কে ভোগ করে—কি করিয়া সুখদুঃখ সহ্য করিতে হয়, এই সকল প্রশ্নের উত্তর আপনি এই ভিক্ষুর কাহিনী হইতে পাইবেন।

পূর্ণ—বেশ ত আপনি বলুন। এখন আমার অন্য কোন কাজ নাই। আপনার কথাগুলিতে বেশ যুক্তি আছে ; আমার ভাল লাগে। অন্য লোক আসিয়া কেবল বাজে কথা বলে। আপনি আসিলে আমার বাজে কথা বন্ধ হয়, অনেক সন্দেহ ও সংশয় দূর হয় এবং চিত্তটা সরল হয়। বলুন, সেই ভিক্ষুর কাহিনী বলুন।

আগন্তুক তখন ভিক্ষুর কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

— —

অর্থ ও অনর্থ

মালব দেশে এক ধনবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দেখিতে অতি সুশ্রী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভিতরটা অত্যন্ত কদর্য্য ছিল। চিত্ত সংযম, বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলির সংযম, ধর্ম্মযাজনের জন্য দেহের ক্লেশ, শুচি, সহিষ্ণুতা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি—ব্রাহ্মণোচিত এই সকল স্বভাবজ কর্ম্ম ত তাঁহার ছিলই না, বরং শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সকল কার্য্য নিন্দিত, সেইজাতীয় কৃষি বাণিজ্যাদি কদর্য্য কার্য্য করিয়া এবং অধর্ম্ম দ্বারা ও স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজনকে নানাপ্রকারে ক্লেশ দিয়া যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কামী, লোভযুক্ত ও অতি কোপনস্বভাব ছিলেন। অর্থদ্বারা কাহাকেও তুষ্ট করা দূরে থাকুক, বাক্যদ্বারাও কাহাকে সন্তুষ্ট করিতেন না। তিনি অত্যন্ত কটুভাষী ছিলেন। এইজন্য পৃথিবীতে কাহারও সহিত তাঁহার প্রীতি বা সদ্ভাব ছিল না। কেহ তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিত না। তিনি একাকী এক গৃহে বাস এবং অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন।

ব্রাহ্মণের যদিও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকল আত্মীয়ই ছিল, তবু কেহ তাঁহার অসদ্ব্যবহারে তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না। পৃথিবীর যাবতীয়

লোক ত তাঁহার শত্রু হইলই, দেবতারা পর্য্যন্ত যজ্ঞাদির অভাবে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আত্মীয় ও পোষ্যদিগকে পালন ও ধর্ম্মকার্য্যাদি না করিয়া এবং নিজে যার পর নাই ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় নষ্ট হইয়া গেল। জ্ঞাতিরা কিছু, দস্যুরা কিছু, অন্য লোক কিছু, রাজা কিছু, এইরূপে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গেল এবং দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার গৃহাদি পর্য্যন্ত নষ্ট হইল। ফলে, ব্রাহ্মণ নির্ধন হইয়া পড়ায় সকলেই তাঁহাকে অনাদর করিতে ও লাঞ্ছনা দিতে লাগিল।

এইরূপ অনাদর ও লাঞ্ছনা পাইয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার নিজ জীবনের সমস্ত কথা ভাবিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। ফলে, অর্থে ও আত্মীয়স্বজনে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, তিনি অনর্থক নিজকে ও আত্মীয়বর্গকে ক্লেশ দিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন—এই অর্থের জন্য তিনি কি না করিয়াছেন! হায়, এই সমস্তই বৃথা হইল! কদর্য্য লোকের ধনসম্পত্তি সুখের নিমিত্ত হয় না। তদ্দ্বারা ইহলোকে অনুতাপ পরলোকে নরকপ্রাপ্তি ঘটে। কুষ্ঠরোগ যেমন রূপবানের রূপ নষ্ট করে, সেইরূপ অতি অল্পমাত্র লোভও যশস্বীদিগের যশঃ ও গুণীদিগের গুণসকল নষ্ট করে। অর্থ

সর্ব্বদাই কষ্টদায়ক—উহা অর্জ্জনে ও বৃদ্ধি করিতে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও ভোগে ত্রাস, এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য এই পনর রকম অনর্থ অর্থ হইতে ঘটে, সুতরাং যিনি অনর্থ না চাহিয়া মঙ্গল কামনা করেন, তিনি অর্থকে নিজের ভোগের জন্য কখনই রাখিবেন না। যে অর্থ ভোগের জন্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা দূরে না রাখিলে নানা অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়। ধনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ হয়; স্ত্রী পিতা, বান্ধব প্রভৃতি শত্রু হইয়া উঠে; প্রিয়জন অপ্রিয় হইয়া উঠে। ধনের জন্য লোকে কি না করে? জীবননাশ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে!

মনুষ্যজন্ম দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণদেহ আরও সুদুর্ল্লভ। এইরূপ দুর্ল্লভ জন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি তাহাকে অনাদর করিয়া স্বার্থ নাশ করে, তাহার মত মূর্খ আর কে আছে? যে ব্যক্তি সঞ্চিত বা প্রাপ্ত অর্থ ভগবৎসেবায় নিয়োজিত না করে, কিংবা দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া না দিয়া কৃপণতা করিয়া কেবল অর্থসঞ্চয়েই মনোনিবেশ করে, তাহার অধঃপতন ঘটে।

এতকাল এই অর্থের জন্য বৃথা জীবন কাটাইলাম !, সমস্ত বল ইহাতেই ব্যয়িত করিয়াছি ! বুদ্ধিমান্ জন এই অর্থ ভগবৎসেবায় অর্পণ করিয়া পরমার্থ লাভ করে। যে বিত্তকে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বলিয়া লোকে ত্যাগ করে, কিংবা যাহাকে সমস্ত অনর্থের মুল বলা হইয়াছে, তাহাই যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তবে তদ্দ্বারা পরমার্থ যে ভগবান্ তাহা লাভ ঘটে ! হায়, আমি কি করিলাম ! আমি অর্থ অর্থ করিয়া জীবন কাটাইলাম। অর্থের জন্য সকলের সহিত বিরোধ করিলাম। সেই অর্থ কোন কাজেই লাগিল না। এই বৃদ্ধকালে আমি কি করিব ! যদি অর্থ থাকিত, তবে তাহা ভগবানের সেবায় লাগাইতাম। হায় ! তাহাও হইল না ! এক্ষণে আমি কি করিব ?

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরমসুখ।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অর্থের অপ্রাপ্তিতে কিংবা নাশে লোকে ভগবান্‌কে নিন্দা করে, কিংবা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করে। ইহা অত্যন্ত

অন্যায় ও অনুচিত। সর্ব্বদেবময় হরি নিশ্চয়ই আমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন, যেহেতু তিনি আমার এই বৈরাগ্যের অবস্থা আনিয়া দিয়াছেন। বৈরাগ্য ব্যতীত জীবের মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং আমি আজ হইতে বৈরাগ্য অভ্যাস করিব।"

এইপ্রকার অভিপ্রায় করিয়া সেই ব্রাহ্মণ সমস্ত অভিমান ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকের বেশ গ্রহণ করিল এবং একাকী সংযতভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা রাখিলেন! পরিধের উত্তম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গৈরিক বহির্বাস ও কৌপীন পরিলেন এবং হস্তে ত্রিদণ্ড ধারণ করিলেন। অসৎ লোকেরা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এইরূপ বেশে দেখিয়া নানাপ্রকারে অপমান ও গালাগালি করিতে লাগিল। কেহ ত্রিদণ্ড, কেহ কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ মালা, কেহ কন্থা, কেহ চীরবস্ত্র কাড়িয়া লইয়া পরিহাস করিতে লাগিল। যখন লোকের উপদ্রবের ভয়ে তিনি ভিক্ষালব্ধ খাদ্য নদীর তীরে নির্জ্জনে আহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ইতর লোকসকল তাঁহার মস্তকে মূত্র ত্যাগ করিতে ও দেহে থুথু ফেলিতে লাগিল। এই সকল অত্যাচারেও যখন তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া

থাকিলেন, তখন তাঁহাকে কথা বলাইবার জন্য তাহারা তাঁহাকে নানা উপায়ে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। কেহ বা ধর্ ধর্, মার্ মার্, বলিয়া তাঁহাকে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বা বলিত এই প্রতারক বকধার্ম্মিক! সকলকে প্রতারণা করিয়া এবং এখনও সকলকে প্রতারণা করিবার জন্য এই ধর্ম্মের পোষাক পরিয়াছে।

নিয়ত প্রতি কার্য্যে এইপ্রকার নির্য্যাতন প্রাপ্ত হইয়াও সেই ব্রাহ্মণ মৌনভাবে সকল সহ্য করিতে লাগিলেন। কাহাকে কিছু বলিলেন না কিংবা তাঁহার বদনে কোনপ্রকার ক্রোধ বা বিরক্তির আভাষ পাওয়া গেল না। যেন তাঁহাকে কেহ কিছুই করে নাই। ব্রাহ্মণ নীরব, উদাসীন ও প্রফুল্ল। অনেকে বাহিরে ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করেন না, কিন্তু অন্তরে ঐ সকলের ভাব পোষণ করেন! ব্রাহ্মণ যে অন্তরে ঐ সকল ভাব পোষণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি?

লোক কর্ত্তৃক এইপ্রকার নিগৃহীত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ নানাস্থানে এই গানটী গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল ঃ—

"আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।

দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥
অশোক অভয় অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হয়ে পদে অনুরাগী ॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত তোমার, তুমি ত আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥

দারা পুত্র নিজ দেহ কুটুম্ব পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ॥

কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার ॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে করি আমি, সে ত সত্য নয় ॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে।
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল মন্দ হ'লে নাহি মোর দায় ॥

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুক্কুর, বলিয়া জানহ মোরে ॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে, রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে ॥
তব নিজ জন, প্রসাদ সেবিয়া, উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে, প্রতিদিন হবে তাহা ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ, সতত চিন্তিব আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব, যখন ডাকিবে তুমি ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে।
এ অধম দাস, তোমারে পালক, বলিয়া বরণ করে ॥

দশম দর্শন

চব্বিশ গুরু

ভিক্ষুকাহিনী শুনিয়া পূর্ণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিছুকাল আবিষ্ট থাকিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। পরে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, ভিক্ষুর কাহিনী শুনিয়া আমি যথেষ্ট বল লাভ করিলাম। কিন্তু আমার মোহ কাটে না কেন? আমি কেন গর্দ্দভের ন্যায় পদতাড়িত হইয়াও গর্দ্দভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি। আপনি যতক্ষণ আমার কাছে থাকেন এবং ধর্ম্মের কথা বলেন, ততক্ষণ বেশ থাকি, কিন্তু স্নান করিয়া উঠিলে যেমন পানা আসিয়া মুক্ত স্থানটুকু আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ আপনি সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা আমার মোহাবৃত চিত্তের যে স্থানটুকু মুক্ত করেন, আপনি চলিয়া গেলে আবার সেইটুকু মোহে আবৃত হইয়া পড়ে। ইহার ব্যবস্থা কি আছে?"

আগন্তুক—পূর্ণ বাবু, আপনার কত জন্মের ময়লা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা পরিষ্কার করিতে হইলে শাস্ত্রকথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা প্রয়োজন। আমি আপনার নিত্য সেবক, যদি শাস্ত্রকথার আলোচনা দ্বারা আমাকে

আপনার সেবা করিবার অধিকার দেন,তবে আমি যথাসাধ্য আপনার সেবায় আত্মবিনিয়োগ করিয়া নিজের মঙ্গল ও জীবন সার্থক করিতে পারি। কারণ, শ্রবণ ও কীর্ত্তন ছাড়া জীব নিজের ও অপরের মঙ্গল করিতে পারে না। আচ্ছা, আপনি বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন। সংসারের অনেক দেখিলেন। আপনার অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শিতায় আপনাকে এ বিষয়ে কিছুই সহায়তা করে না কি? লোকে ত দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিখে, কেহ ঠকিয়াও শিখে! আপনি এই দৃশ্যমান্ জগৎ হইতে এই চৌষট্টি বৎসরে কি শিক্ষা করিলেন?

পূর্ণ—কি ছাই শিখিব! জীবনটা ভরিয়া শুধু ঠকিয়াই গেলাম; আর উপকার করিয়া শুধু প্রতিদানে অপকার—অকৃতজ্ঞতাই পাইলাম! লোকের ভাল করিতে গিয়া শুধু অপযশের ভাগী ও শত্রু হইলাম!

আগন্তুক—কেন? শিখিবার জিনিষ ঢের আছে। আপনি বোধ হয়, উপকারের বা কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশায় এরূপ করিয়াছেন। নতুবা এরূপ বলেন কেন? আমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ, তুচ্ছ আশ্চর্য্য, সকল জিনিষ হইতেই শিক্ষা পাইয়া থাকি। এইরূপ শিক্ষালাভ করি না বলিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা। সংসার-সংগ্রামে জয়ী

হইতে পারি না। আপনি সেই অবধূতের 'চব্বিশ গুরুর' কথা ত জানেন?

পূর্ণ—না। কোন্ অবধূত? চব্বিশ গুরু আবার কেমন? গুরু না একজন আপনি সেদিন বলিলেন, আজ আবার এমন কথা বলেন কেন?

আগন্তুক—তবে শুনুন। একটী একটী করিয়া বলি।

পৃথিবী

পৃথিবী হইতে ক্ষমা শিক্ষা করিতে হয়। পৃথিবীর দুই রূপ—পর্ব্বত ও বৃক্ষরূপ। পর্ব্বত নির্ঝরবারি, বিবিধ রত্ন ও ওষধি প্রদান করিয়া পরোপকার করিয়া নির্জ্জন বাস করিতেছে। বৃক্ষ ফল, মূল, পত্র, পুষ্প দ্বারা জীবের সেবা করিতেছে। স্বীয় মস্তকে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া পথিককে, এমন কি, কর্ত্তনকারীকে আশ্রয় প্রদান করিতেছে। বৃক্ষ কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করে না। শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়, তবু কাহারও নিকটে কিছু চায় না। এই সহিষ্ণুতা ও পরোপকারবৃত্তি বৃক্ষ হইতে শিক্ষা করিতে হয়।

বায়ু

বায়ু দুইপ্রকার, প্রাণবায়ু ও বাহ্য বায়ু। প্রাণবায়ু চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রিয় বিষয়ের অপেক্ষা করে না,

শুধু আহার দ্বারাই তুষ্ট থাকে ! আমরাও তদ্রূপ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য বিষয় ভোগ করিব না। প্রাণবায়ুর অল্পতায় জ্ঞান নাশ ও মনোবুদ্ধি বিকীর্ণ হয়। সুতরাং এমন আহার করা কর্ত্তব্য, যাহাতে প্রাণ-রক্ষা হয়, তদতিরিক্ত আহার করিলে, জ্ঞাননাশ এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইবে। অতি রুক্ষ বা অতি স্নিগ্ধ আহার দ্বারা মন বিক্ষিপ্ত হয় কিংবা আলস্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের চপলতা আনয়ন করে।

বাহ্য বায়ু যেমন পৃথিবীর সকল পদার্থের সঙ্গ করিয়াও তাহার সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের বিষয়ের সহিত অনাসক্তি শিক্ষা করিতে হইবে। বিষয়ের সহিত সম্পর্ক থাকিবে, অথচ বিষয়ী হইবেন না। বায়ু, জল ও অগ্নির সঙ্গ করিয়াও যেমন উহা জল বা অগ্নির দ্বারা অভিভূত হয় না, তদ্রূপ জীবও দেহ ও মনের সহিত একত্র থাকিয়াও দেহ ও মনের ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা পৃথক্, এই শিক্ষা করিতে হইবে।

আকাশ

বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত মেঘ যেমন আকাশকে স্পর্শ করে না, তদ্রূপ জীবাত্মা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই সকল জড় পদার্থের

সহিত একসঙ্গে থাকিলেও, এই সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আকাশ যেমন ক্ষুদ্র ঘটে থাকে বলিয়া ঘটত্ব প্রাপ্ত হয় না, জীবও তদ্রূপ ছোট বড় বিভিন্ন দেহে অবস্থান করিলেও সেই সকল আকার প্রাপ্ত হন না। পরমাত্মা ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থের ভিতরে ও বাহিরে আছেন। ভিতরে আছেন বলিয়া তাহার ব্যাপকতা ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। আকাশ হইতে এই সকল শিক্ষা করা যায়।

জল

জল যেমন স্বভাবতঃ নির্ম্মল, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মধুর, এবং তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত, আমরাও তদ্রূপ অপরের সহিত এমন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, মধুর আলাপ করিব এবং ভগবানের কথা দ্বারা অপরের চিত্ত পবিত্র করিব। জল যেমন সকলেরই মিত্র, আমরাও তদ্রূপ সকলের সহিত মিত্রতা করিব। আমরা এমন সদাচারসম্পন্ন হইব যেন, আমাদের দর্শন ও স্পর্শনদ্বারা অপরে পবিত্র হইতে পারে।

অগ্নি

কাষ্ঠেই অগ্নি থাকে, কিন্তু ঘর্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়। তদ্রূপ পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন, ভক্তিদ্বারা তাহাকে

জানিতে পারা যায়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠে থাকিলেও কাষ্ঠ অগ্নিকে পুড়াইতে পারে না, অগ্নিই কাষ্ঠকে পুড়াইয়া ফেলে, তদ্রূপ পরমেশ্বর মায়াতে আছেন বটে, কিন্তু মায়া তাঁহাকে কিছু করিতে পারে না। যুক্তাত্ম ব্যক্তি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তপস্যায় প্রদীপ্ত, অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া কোনপ্রকার পাপে লিপ্ত হইবেন না, যেমন অগ্নি দ্রব্যের মল দগ্ধ করে, কিন্তু নিজে মলিনতা প্রাপ্ত হয় না। তিনি অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন কখনও প্রকাশিত হইয়াও শ্রেয়োভিলাষী কর্তৃক উপাসিত হইয়া ভূতভবিষ্যৎ পাপপুণ্য দগ্ধ করিয়া দাতা যাহা দিবেন তাহাই ভোজন করিবেন। অগ্নির স্বরূপতঃ যেমন উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, কেবল শিখার উৎপত্তি বা নাশ, তদ্রূপ দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

চন্দ্র

কালেতে চন্দ্রের কলাসকলের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, বস্তুতঃ চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ জন্ম অবধি মরণ পর্য্যন্ত অবস্থান্তর দেহেরই, আত্মার নহে।

সূর্য্য

সূর্য্য ভূপৃষ্ঠ হইতে জল শোষণ করিয়া লয় বটে, কিন্তু তাহা নিজে গ্রহণ করে না, তদ্রূপ আমরাও ইন্দ্রিয় দ্বারা

বিষয় গ্রহণ করিব বটে, কিন্তু সেই সকল বিষয় প্রার্থীকে প্রদানের জন্যই গ্রহণ করিব, নিজের ভোগের জন্য নহে। সূর্য্য যেমন একটী বই দুইটী নাই ; কিন্তু ভিন্ন জলপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ পরামাত্মা স্বরূপতঃ এক হইলেও জীবের দেহাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাধিবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় ! উপাধিবিহীন জীব পরামাত্মাকে একই ভাবে দর্শন করেন।

কপোত

কপোত কপোতী একত্র বাস, একত্র আহার, একত্র শয়ন, ইত্যাদি সকল কার্য্যেই অত্যন্ত আসক্তি প্রদর্শন করে। ইহা দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কপোতকে যদি কিছুকাল অপর এক কপোতীর সঙ্গ দেওয়া যায়, তবে সে পূর্ব্ব কপোতীকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া নূতন কপোতীর সঙ্গে বিহার করিতে থাকে। সাময়িক খুব প্রীতির উচ্ছ্বাস দেখায় বটে, কিন্তু উহা কামনামূলক। মনুষ্যের দাম্পত্যপ্রেমও ঐরূপ বটে। কামনার বশবর্ত্তিনী যে দাম্পত্যপ্রীতি, তাহা প্রীতি নহে। যখন পুরুষ ধর্ম্মসাধনের সহায়কারিণীরূপে স্ত্রীকে এবং স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যের সহায়কারিরূপে পুরুষকে সঙ্গিনী ও সঙ্গিরূপে গ্রহণ করে, তখনই উহারা দম্পতী বলিয়া গণ্য। নতুবা

উহা কপোতের দাম্পত্যে পরিণত হইবে। শাবকগুলি বিপন্ন হইলে যেমন কপোতকপোতী উহাদিগের সহিত নিজেরা বিপন্ন হয়, মনুষ্যও তদ্রূপ সন্তানের সহিত নিজকে বিপন্ন করে।

অজগর

প্রারব্ধভোগ অবশ্যই হইবে। সুতরাং তজ্জন্য বৃথা উত্তম করিয়া আয়ুর্নষ্ট করিবে না। স্বর্গে ও নরকে উভয় স্থানেই প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়জনিত সুখ দুঃখ সমান। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে সুখ ইচ্ছা করিবেন না। যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা শরীরমাত্র নির্ব্বাহ করিবে। খাদ্য দ্রব্য মিষ্ট হউক, বিরস হউক, অধিক হউক, অল্প হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলে উদাসীন হইয়া অজগরের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিবে। আর যদি গ্রাস উপস্থিত না হয়, অজগরের ন্যায় দৈব হেতু হইতেছে না জানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে।

সমুদ্র

বর্ষাকালে বহু নদনদী হইতে জলরাশি সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন উহার বৃদ্ধি লক্ষ্য হয় না এবং গ্রীষ্মকালে নদনদী শুকাইয়া গেলেও যেমন সমুদ্রের জল কমে না, তদ্রূপ

জীবেরও কামনা পূর্ণ হউক না হউক, জীব একই অবস্থায় থাকিবেন। সমুদ্র যেমন বিস্তৃত, বাহিরে উল্লসিত অন্তরে গম্ভীর, সামান্য বায়ুতে ক্ষুব্ধ হয় না, উহার তলদেশ সহজে স্পর্শ করা যায় না, উহাকে সহজে অতিক্রম করা যায় না, সাধকও তদ্রূপ হইবেন।

পতঙ্গ (রূপজ মোহ)

মূর্খ ব্যক্তিরা মায়ারচিত স্ত্রী, স্বর্ণাভরণ, বস্ত্রাদি দ্রব্য বিষয়ে ভোগবুদ্ধিতে প্রলুব্ধ হইয়া বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ পতঙ্গের ন্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভ্রমর ও মধুমক্ষিকা (গন্ধ)

একই পদ্মের গন্ধে লুব্ধ হইয়া যেমন মধুকর দিবাবসানে মুকুলিত পদ্মের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে; কিন্তু যে ভ্রমর প্রত্যেক পুষ্প হইতে একটু একটু করিয়া মধু সংগ্রহ করে, সে যেমন ঐরূপ আবদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে না, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও একই গৃহস্থকে উৎপীড়ন বা হিংসা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবেন না, মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। মধুমক্ষিকা যদিও একটু একটু করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তবুও সঞ্চয়বুদ্ধিবশতঃ মধুসহ নিজেরা বিনষ্ট হয়। সুতরাং যাঁহারা মাধুকরী

করিবেন, তাঁহারা সঞ্চয়বুদ্ধি করিবে না। যে লুব্ধ ব্যক্তি অতি ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ নিজের জন্য বা বা সন্তানাদির জন্য সঞ্চয় করে, তাহার সঞ্চিত ধন অন্য লোকে আসিয়া ভোগ করে। যাহারা সঞ্চয়বুদ্ধি লইয়া গৃহাসক্ত হয় এবং বিত্ত সংগ্রহ করে, যতিগণ সেই বিত্ত সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিবেন।

হস্তী (স্পর্শ)

তৃণাদিযুক্ত গর্ত্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তিনী দেখিয়া তাহার গাত্রস্পর্শজনিত সুখের লালসায় যেমন হস্তী সেই গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারায়, তদ্রূপ সাধক যুবতীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, 'দারু প্রকৃতি' (কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি) স্পর্শ করিলেও তাহার পতন হইবে।

হরিণ (শব্দ)

বনচারী যতি বা ব্রহ্মচারী ভগবদ্‌বিষয়ক কথা ভিন্ন গ্রাম্য কথা শুনিবেন না। ব্যাধের মোহন বংশীধ্বনিতে হরিণ পলায়ন না করিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ এবং ব্যাধের হাতে প্রাণ ত্যাগ করে। ঋষ্যশৃঙ্গও স্ত্রীলোকের ক্রীড়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মৎস (রস)

জিহ্বার লোভে মৎস যেমন বড়িশবিদ্ধ মাংসখণ্ডে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, অসদ্বুদ্ধি লোকেরাও জিহ্বার লোভে অসদ্বিষয়ে ধাবিত হয়।

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ, মীন এই পাঁচটী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ, রস যথাক্রমে ইহার এক একটীর লোভে বিপন্ন হয়! যদি কেহ এক সঙ্গে এই পাঁচটীর লোভে পড়েন, তবে তাহার দুর্গতির বিষয় আর কি বলা যায়? কর্ণ শব্দ, চর্ম্ম স্পর্শ, চক্ষু রূপ, নাসিকা গন্ধ ও জিহ্বা রসের জন্য লালায়িত। ইহার মধ্যে জিহ্বাই অতি বলবান্। জিহ্বাকে জয় না করিয়া, যদি অপর চারিটীকে জয় করা যায়, তবে জিহ্বা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অপর চারিটীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জিহ্বাকে সংযত করিলে, জিহ্বাজয় হয় না, কারণ ভোগবুদ্ধি থাকিয়া যায়, সুতরাং ভোগবুদ্ধিকে বিনাশ করিলেই জিহ্বাজয় করা হইবে।

পিঙ্গলা

পূর্ব্বকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে এক বারস্ত্রী বাস করিত। সে যখন একদা সমস্ত রাত্রি উত্তম বেশভূষা পরিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়াও কোন ধনীর নিকট

এক কপর্দ্দকও সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন সে ভাবিতে লাগিল "হায়! আমি বিবেকশূন্যা! আমার কি ভীষণ মোহ, আমি অজিতাত্মা, যেহেতু আমি মূর্খের ন্যায় অতি তুচ্ছ কান্তের নিকট বিষয় কামনা করিতেছি। যিনি নিত্যকাল আমাকে নিত্য ধন দিবেন, আমি তাঁহার নিকট কেন সেই নিত্য ধন কামনা করি না? অজ্ঞের ন্যায় দুঃখ, ভয়, শোক এবং পীড়াদায়ক ও অতি তুচ্ছ পুরুষের নিকট করিতেছিলাম!

এই দেহটী একটী বংশের ন্যায়। অস্থিনির্ম্মিত ও ত্বক্ রোমাদি দ্বারা আবৃত এবং ক্লেদক্ষরিত নবদ্বারবিশিষ্ট অথচ বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ অতি হেয় এই শরীরকে আমার ন্যায় মূর্খ ব্যতীত কে যত্ন ও আদর করে? শরীরীদিগের প্রিয়তম সুহৃৎ ঈশ্বরের নিকট এই দেহ নিবেদন করিয়া দিলাম। কাম্য বিষয়সকল, কামদাতা নরসকল, এবং দেবতাগণ সকলেই অনিত্য; সুতরাং ইহারা কামিনীদিগের কি প্রিয় সাধন করিতে পারে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার কোন অলক্ষিত কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এইপ্রকার বৈরাগ্য প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আমি ভগবানের এই কৃপা মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম।

সংসারকূপে পতিত, বিষয়মোহে অন্ধ এবং কালসর্প কর্তৃক দষ্ট এই আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন আর কে সমর্থ ?

আশাই পরম দুঃখের কারণ। নৈরাশ্যই পরম সুখ। যেহেতু এই পিঙ্গলা কান্তবিষয়ক আশা পরিত্যাগ করিয়াই একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া সুস্থ হইয়াছিল।

কুরর পক্ষী

মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয় সেই সেই বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের কারণ। অতএব তিনিই অকিঞ্চন, যিনি অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করেন।

বালক

আমার মান বা অপমান কিছুই নাই অথবা গৃহস্থ পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কোন চিন্তাও নাই। অতএব আমি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিব। অজ্ঞ উদ্যমরহিত বালক ও অজ্ঞানাতীত ভক্ত উভয় ব্যক্তিই চিন্তারহিত ও পরমানন্দে মগ্ন থাকেন।

কুমারী

এক কুমারী উদূখলে ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার কালে, তাহার হাতের কঙ্কণগুলির শব্দ হইতেছে দেখিয়া এবং পাছে তাহাকে বিবাহকারী ব্যক্তি সেই শব্দ শুনিতে পায়, এই ভয়ে প্রত্যেক হস্তে দুইগাছিমাত্র কঙ্কণ রাখিয়া বাকীগুলি খুলিয়া রাখিল। পরে যখন দেখিল, সেই দুইগাছিতেও শব্দ হয়, তখন সে প্রত্যেক হস্তে এক গাছি করিয়া রাখিল। তখন আর শব্দ হইল না। বহুলোকের একত্র বাস কেবল কলহের কারণ হয় এবং উভয় ব্যক্তির একত্র সহবাসও কেবল কথোপকথনের কারণ হয়। সুতরাং যেখানে গ্রাম্যকথা হয়, কিংবা যেখানে ভক্ত নাই সেস্থানে বাস না করিয়া বরং একাকী বাস করিবে।

লৌহকার

লৌহকার যখন উত্তপ্ত লৌহ পিটাইতে থাকে, তখন তাহার চিত্ত চতুষ্পার্শ্বের অন্য কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। একাসনে রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া সে কার্য্য করে। তদ্রূপ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও আমাদের ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়া আবশ্যক। বিষয়ে আসক্তি থাকিতে আত্মার উন্মেষ হয় না। যাহারা বাণ

তৈয়ারী করে, তাহারা যেমন বাণ বাঁকাইবার কালে তাহাদের পার্শ্ব দিয়া ভেরীভাঙ্কার বাজাইয়া রাজা চলিয়া গেলেও তাহা দর্শন করিবার অবসর পায় না, ভগবদ্ভজন-কারীও তদ্রূপ বিষয়ে আকৃষ্ট হন না।

সর্প

ভক্তের সঙ্গ সর্ব্বদাই করিবে। যে অভক্ত অর্থাৎ ভগবানের সেবা করে না, তাহার সঙ্গ সর্ব্বদাই ত্যাগ করিবে। সর্প ক্রূর, হিংস্র ও মারাত্মক প্রাণী এই জন্য সকলেই সর্পের সঙ্গ হইতে দূরে থাকেন। সর্প নিজে গৃহাদি করে না, নির্জনে একাকী বাস করে, মিতভাষী কিন্তু হিংস্র। সুতরাং শুধু অনিকেত একাকী থাকিলে ও মিতভাষী হইলেই সাধু বা ভক্ত হওয়া যায় না।

মাকড়শা

মাকড়শা যেমন হৃদয় হইতে সূতা বিস্তার করিয়া তাহাতে খেলা করিয়া পুনরায় তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন।

কুমারিকা কীট

দেহী ব্যক্তি স্নেহবশতঃই হউক বা দ্বেষবশতঃই হউক, কিংবা ভয়বশতঃই হউক, যেখানে যেখানে বুদ্ধির সহিত

একাগ্ররূপে মন ধারণ করেন, তাহার সেই সেই রূপই প্রাপ্তি হয়। কুমারিকা কীট যখন আরসুলাকে আক্রমণ করে, তখন আরসুলা ভয়ে কুমারিকা কীটের দিকে চাহিয়া থাকে এবং তাহার বিষয় চিন্তা করিতে থাকে। এইভাবে আরসুলার দেহ কুমারিকা কীটের দেহের ন্যায় হইয়া যায়।

মনুষ্য শ্রেষ্ঠ কেন ?

নিজের দেহ হইতে বিরক্তি ও বিবেক শিক্ষা করা যায়। এই দেহ নিত্যকাল থাকে না। ইহার জন্ম, অবস্থান ও মৃত্যু আছে। সুতরাং ইহাতে আসক্ত হওয়া অন্যায়। ইহা শৃগালকুকুরে ভক্ষণ করিবে, সুতরাং ইহার জন্য যত্নবান্ হইব না। এই দেহ সতত ক্লেশই দিয়া থাকে। এই দেহের একাংশ উদর। তাহা দুই তিন দিবস খাদ্য না পাইলেও কাহাকেও কিছু বলে না। ইহা হইতেও বৈরাগ্য শিক্ষা করা যায়। দেহের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলি যখন বিষয় ভোগ করে, তখন ইহারা শত্রু, কিন্তু এইগুলিকে যদি ভগবানের সেবাকার্য্যে

লাগান যায়, তখন ইহারা পরম মিত্র হইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির কার্য্যে কর্ণ জিহ্বা ইত্যাদিকে নিযুক্ত করিলে, ইহারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও বিষয়ে আসক্ত হয় না। জিহ্বা যেমন ঘৃতপক্কদ্রব্যাদি আস্বাদন করিলেও তাহাতে আসক্ত হয় না, কিন্তু পান আস্বাদন করিলে তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং এই দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়া ইহাতে আসক্ত হইতে নাই। এই বিবেক দেহ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে সকল বৃক্ষ ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়, সেগুলিকে ওষধি বলে। গাছটী মরিয়া গেলেই গাছের শেষ হইল না। ফলে যে বীজ রাখিয়া গেল, তাহা হইতে আবার গাছ জন্মিবে। এইরূপ মনুষ্য মনে করে, এই দেহ নষ্ট হইয়া গেলে দেহের যখন শেষ হইল, তখন ইহার কর্ম্ম-রূপ ফলগুলিও নষ্ট হইয়া গেল! কিন্তু তাহা নহে। দেহ থাকা কালে লোকে যেমন কর্ম্ম করিবে, দেহবিনাশে, সেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য আবার দেহ গ্রহণ করিতে হইবে। যে দেহের সুখের জন্য স্ত্রীপুত্রাদি পোষণ করা হয়, তাহারা কেহই সেই কর্ম্মফল নষ্ট করিতে পারে না। বহুভার্য্য পুরুষকে তাহার সপত্নীগণ যেমন আকর্ষণ করে, ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ দেহকে বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনুষ্যদেহ ও অন্যান্য জীবের দেহ হইতে এই সকল শিক্ষালাভ করিয়া বুঝিতে পারে, মনুষ্যজন্মের একটা বিশিষ্টতা আছে। এই যে বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন গুণ বা শিক্ষণীয় বিষয় আছে, ইহা সেই সেই দেহ বুঝিতে পারে না। মনুষ্যই এই সকল দেহের বিষয় চিন্তা করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে। ভগবান্ একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ, অপদ নানা দেহ সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এই দেহে জীব তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। সুতরাং তিনি মনুষ্যদেহ সৃষ্টি করিলেন। জীব এই দেহ লাভ করিয়া ভগবানের বিষয় এবং অন্যান্য সকল দেহের বিশেষতা জানিয়া ভগবানের ভজন করিতে সমর্থ হইবে। দেহের সাধারণ ক্রিয়া ও ধর্ম্ম সর্ব্ব দেহেই সমান ; কিন্তু মনুষ্যজন্ম লাভ করিলে জীবসকল "পরম-অর্থ" অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থ ভগবদ্ভক্তি বা প্রেম লাভ করিতে পারে। অন্য কোন জন্মে এই পরমার্থ লাভ করা যায় না। সুতরাং ধীর ব্যক্তি কালবিলম্ব না করিয়া সেই পরমার্থলাভের জন্য তৎক্ষণাৎ চেষ্টা করে। কারণ কোন্ সময়ে এই দেহ নষ্ট হইবে, তাহার স্থিরতা নাই এবং আবার যে এই মনুষ্যদেহ লাভ ঘটিবে, এমনও নিয়ম নাই।

একাদশ দর্শন

বন্ধু কে ?

১৩২৯ সালের ২২শে ফাল্গুন। আগন্তুক প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণচন্দ্রের নিকট শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমার কাহিনী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-কথা বলিতেছেন। রাত্রি একটু অধিক হইয়াছে। বাসন্তী শশীর স্নিগ্ধ চন্দ্রিকারাশি পূর্ণের ও আগন্তুকের চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তখন আগন্তুক একটী গান ধরিলেন।

"অনাদি করম-ফলে, পড়ি ভবার্ণবজলে
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত
প্রবৃত্তি-ঊর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা॥
জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।

এ হেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু
কৃপা করি তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্মধূলি করি,
দেহ এ অধমে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥"

গানটী শেষ হইল। পূর্ণ নিস্তব্ধ। রজনী নিস্তব্ধ। সহরের ব্যস্ততা ও কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। গানটী পূর্ণের প্রাণের তন্ত্রীগুলিতে কি এক ঝঙ্কার দিয়াছে, পূর্ণই জানে। সে নীরব হইয়া রহিল। তখন আগন্তুক আর একটী গান ধরিলেন—

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন-অভয়চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানবজনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত-আতপ বাত বরিক্ষণে এ দিনযামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি পরতীতি রে।
কমলদলজল জীবন টলমল, ভজহ হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে।
পূজনসখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥

পূর্ণ সম্প্রতি শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর পড়িয়াছে। এই গান দুইটী শুনিয়া সে মোহমুদ্গরের অনেক কথা

মনে করিতে লাগিল। পরে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল "দেখুন, আমার এই চৌষট্টী বৎসরে আমি বেশ বুঝিয়াছি স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি সব 'কৃপণ দুর্জ্জন'। ক্ষণিক সুখের জন্য কি না করিয়াছি। 'শীত-আতপ-বাত-বর্ষা' কিছুই গ্রাহ্য করি নাই! ইহাদের সুখের জন্য সকলই তুচ্ছ করিয়াছি। কিন্তু তাহার পরিণাম কি এই? আমি আর সহ্য করিতে পারি না। আপনার পায়ে পড়ি। আমাকে এমন ব্যবস্থা করিয়া দি'ন, যাহাতে আমি নিজকে সাম্‌লাইতে পারি। আমি বুঝিয়াও কিছু বুঝি না! আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যাইতে চায়! হায়, আমার জীবনটা কি এমন ভাবে যাইবে? আমি ভগবানের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমার এই কষ্ট! আমার এই কষ্টের একটা কিনারা করিয়া দি'ন।"

আগন্তুক—পূর্ণ বাবু, আপনার কষ্টের কিনারা করিবার আমার কি সাধ্য? আপনি ভগবানের নিকট কাঁদিয়া বলুন, তিনিই আপনাকে সকল ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিবেন। মায়ার হাতে পড়িয়া এমন হাবুডুবু খাইতেছেন। সুতরাং মায়ার অধীশ্বর যিনি, সেই ভগবানের শরণাগত হউন। তখন মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

"মায়াকে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়"

পূর্ণ—কথা ত বুঝি। কিন্তু পারি না যে !

আগন্তুক—হঁা।

"সাধুকৃপা বিনে আর নাহিক উপায়।"

পূর্ণ—আপনি ঘুরিয়া ফিরিয়া এই কথাই বলেন। সাধু কে ? আমি সাধু চিনিব কেমন করিয়া ? সাধু আমার কি করিবেন ? সাধু নাই কোথায় ? এই বলিলেন ভগবানের শরণাগত হইতে, আবার বলেন সাধুর কৃপা ছাড়া কিছু হইবে না !

আমি কে ?

"ভগবান্ বলিয়াছেন, 'সাধু আমার হৃদয়, আমি সাধুদের হৃদয়। সাধুদের চিত্তেই আমি বাস করি। সুতরাং আমার কাছে আসিতে হইলে, সাধুদের নিকট যাইবে। সাধুকে শক্ত করিয়া ধর, তবে আমাকে পাইতে আর বিলম্ব হইবে না। আমি ভক্তের দাসত্ব করি, ভক্তের অনুরোধ রক্ষা করি, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করি। সুতরাং যদি আমাকে চাও, তবে সাধুর নিকট যাও'।"—এই

কথাগুলি পূর্ণের জানা ছিল, তবুও চিত্তের চঞ্চলতায় ও মনঃকষ্টে পূর্ব্বেকার কথাগুলি বলিয়াছে। আবার স্থির হইয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল "দেখুন, কিসে আমার মঙ্গল হয়—বেশ বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে বলুন ত। অনেক কথা ত আপনার নিকট শুনিলাম। সবটা যেন গুলিয়া গিয়াছে।

আগন্তুক—একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ—

"কে আমি ? কেন মোরে জারে তাপত্রয় ?"
"কিছু নাহি জানি কৈছে হিত হয় ॥"
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আপনি।

"আমি কে ? আমাকে ত্রিতাপ জারে অর্থাৎ জ্বালা দেয় কেন ? আমার হিত কিসে হয় ?" প্রভু, দয়া করিয়া এই সকল তত্ত্ব আমাকে বলিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন "সনাতন, তুমি জীব। তোমার দুইটী রূপ—একটী স্বরূপ ও অপরটী বিরূপ। স্বরূপে ত্রিতাপ নাই, বিরূপেই ত্রিতাপ আছে। সুতরাং ত্রিতাপ স্বরূপকে জ্বালা দিতে পারে না, বিরূপকেই পারে।

পূর্ণ—মহাশয়, জীবের আবার স্বরূপ কি ? এই যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর প্রভৃতি

জীব দেখিতেছি, ইহা ছাড়া আবার কি রূপ আছে?

আগন্তুক—হাঁ, এই গুলিকে আমরা জীব বলি বটে; কিন্তু যে আকারটী চক্ষে দেখি, তাহা জীব নহে! উহা জীবের একটা আবরণমাত্র। যে জিনিষটী এই আবরণের সঙ্গে থাকাতে ইহাকে জীব বলি, সেইটীই জীব।

পূর্ণ—বেশ, তা' হ'লে, এই আবরণের ভিতরে ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আছে, তা' হ'লে সেগুলিই জীব।

আগন্তুক—না, সেগুলি জীব নহে। যদি তাহা হইত, তবে যখন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের ক্রিয়া স্তব্ধ থাকে, তখন এই আবরণ বা দেহকে মৃত বলা হইত। কিন্তু তাহা হয় না। তাহা হইলে, এই দেহ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ছাড়া আরও একটী জিনিষ আছে, তাহাই জীব বা জীবন। এই জীবের অপর নাম আত্মা বা জীবাত্মা। এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। ছোট বড় যে কোন দেহেতে গেলেও ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ইহা নিত্য, শাশ্বত, সনাতন।

জন্ম ও মৃত্যু

পূর্ণ—তবে জন্ম, মৃত্যু কাহার হয় এবং কেন হয়?

আগন্তুক—এই দেহের জন্ম মৃত্যু হয়। বাসনা হইতে কর্ম্ম হয়। কর্ম্মফল ভোগের জন্য দেহের জন্ম, এবং যে কর্ম্মফলটুকু ভোগের জন্য সেই দেহের জন্ম হয়, যখন সেই কর্ম্মফলভোগ শেষ হয়, তখন সেই দেহের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু বা নাশ হয়।

কাম ও প্রেম

পূর্ণ—এই বাসনা কাহার? কেন হইল?

আগন্তুক—জীবাত্মাই জীবের 'স্ব' অর্থাৎ নিজের 'রূপ'। এই স্বরূপের দুইটী বৃত্তি নিত্যকাল যুগপৎ আছে। একটী বৃত্তি ভগবান্‌কে সেবা করে, অপরটী ভগবানের সেবা ছাড়ে বা ভুলে। ভগবান্‌কে সেবা করার যে ইচ্ছা তাহার নাম প্রেম, আর ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দিয়া নিজে প্রভু সাজিয়া সেবা পাইবার যে ইচ্ছা, তাহার নাম বাসনা বা কাম। এই দুইটী বৃত্তি প্রেম ও কাম জীবাত্মায় নিত্য কালই আছে। কিন্তু এই দুইটীর ক্রিয়া এক সময়ে

হয় না। যখন প্রেম ক্রিয়া করে, তখন কাম নিষ্ক্রিয় থাকে, আবার যখন কাম ক্রিয়া করে, তখন প্রেম নিষ্ক্রিয় থাকে। জীবাত্মা চেতন বলিয়া তাঁহার ক্রিয়া করিবার স্বতন্ত্রতা আছে, অর্থাৎ প্রেম বা কামের দুইটীর একটী ক্রিয়া করিবে। যখন জীবাত্মা প্রেম ছাড়িয়া দেয়, তখনই তাহার বাসনা বা কাম ক্রিয়া করে।

পূর্ণ—তবে, জীবাত্মা প্রেম ছাড়িয়া কাম করিল কেন?

আগন্তুক—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ জানিতে পারিলেই এই সব কথা বুঝিতে সুবিধা হইবে। জীবাত্মা পরমাত্মার অতি সূক্ষ্ম অংশ। এই পরমাত্মাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান্ বলেন। যাঁহারা পরমাত্মাকে নিরাকার নির্বিকার নির্বিশেষ বোধ করেন, তাঁহারা তাঁহাকে জ্যোতি বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। এই 'ব্রহ্ম' শুধু 'সৎ' অর্থাৎ নিত্যবর্ত্তমান। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে 'জ্ঞানী' বলে। জ্ঞানিগণ জীবাত্মা পরমাত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সকলই ব্রহ্ম—জীবাত্মা পরমাত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। আর এক শ্রেণীর তত্ত্ববিৎ বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইই আছেন। পরমাত্মার কোন আকার নাই, সুতরাং জীবাত্মারও কোন আকার নাই। কিন্তু ইঁহাদের পৃথক্ সত্ত্বা আছে। 'পরমাত্মা'

'সৎ' ও 'চিৎ' অর্থাৎ নিত্যবর্ত্তমান ও নিত্যচৈতন্য, নিজে কোন বিষয়ে লিপ্ত না হইয়া জীবাত্মার কর্ম্মের সাক্ষী থাকেন এবং কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করেন। জীবাত্মা সাধন করিতে করিতে পরমাত্মায় মিশিয়া পরম আনন্দ ভোগ করে। ইঁহাদিগকে 'যোগী' বলে। 'ভক্ত' নামে আর একশ্রেণীর তত্ত্ববিৎ আছেন, তাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বীকার করেন। যাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায়, তাঁহার নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যলীলা, নিত্যধাম আছে। তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। অর্থাৎ ভগবানে ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব দুই-ই আছে। জীবাত্মা ভগবানের অতি সূক্ষ্ম অংশ। ভগবানের অনন্ত শক্তি প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তি। ভগবান্ এই ত্রিবিধশক্তিমান্। অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা তিনি নিত্যকাল স্বীয় ধামে নিত্যলীলা করিতেছেন। বহিরঙ্গা শক্তিকে মায়াশক্তিও বলে। এই মায়াশক্তি হইতে জড় জগৎ উদ্ভুত। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলে। এই তটস্থা শক্তি হইতে জীবসমূহ উদ্ভুত। জল ও স্থলের মিলন বা সন্ধিস্থলকে তট বলে। তদ্রূপ অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী তটস্থা শক্তি হইতে উদ্ভুত জীবের অন্তরঙ্গা শক্তির ও

বহিরঙ্গা শক্তির অন্তর্গত হইবার যোগ্যতা আছে। এই যোগ্যতা আছে বলিয়া জীব স্বায় স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহার করিয়া প্রেম বা অসদ্‌ব্যবহার করিয়া কামে প্রবৃত্ত হয়।

জীবের দেহ

পূর্ণ—বেশ ত। জীবাত্মা কামে প্রবৃত্ত হইলে, জীবাত্মাই ত ভোগ করিবে। তাহার সঙ্গে আবার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও দেহ আসিয়া জুটে কেন?

আগন্তুক—জীবাত্মার যে মন, যে বুদ্ধি, যে অহঙ্কার এবং যে দেহ, তাহাদ্বারা কামের ক্রিয়া করিতে পারে না। যেহেতু ঐ সকল চিন্ময়। মায়া জড়। সুতরাং জড়ই জড়কে ভোগ করিবে বা জড়ই জড়ের সঙ্গ করিতে সমর্থ। জীবাত্মা যখন জড়ভোগের বাসনা বা কামনা করে, তখনই তাহার মনের সৃষ্টি হয়। মনের অপর নাম বাসনা। এই মনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রাকৃত অর্থাৎ চিৎ-এর বিপরীত অভিমান আইসে, তাহার নাম অহঙ্কার। সুতরাং জীবাত্মার দুইটী অহঙ্কার—একটী সে চিন্ময়—ভগবানের অংশ—ভগবানের নিত্যসেবা বা প্রেমই তাহার ধর্ম্ম, এই অহঙ্কার, ইহাই জীবের স্বরূপ। অপরটী, সে জীবাত্মা নহে, সে জড়, সে জড়ের ভোক্তা, সে অনিত্য—জন্মে মরে। ইহাই

জীবের বিরূপ। এই বিরূপই ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশরূপ পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহ ধারণ করে। যাহার যেরূপ বাসনা, সে তদ্রূপ দেহ পাইল। বাসনা বাসনাকে বৃদ্ধি করে। বাসনা দ্বারা বাসনার শেষ হয় না। সুতরাং একবার বাসনা করিয়া জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতেছেন।

পূর্ণ—কত দিন যাবৎ জীবাত্মার এইরূপ দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটিতেছে?

আগন্তুক—যতদিন ভগবান্ আছেন, ততদিন। কেন না, জীবের সৃষ্টি হয় নাই। যাহা পূর্ব্বে থাকে না, পরে হয়, তাহাকেই সৃষ্ট বলে। জীব ত নিত্য, যেহেতু ইনি নিত্য ও অনাদি যে ভগবান্ তাঁহার অংশ। সুতরাং জীব অনাদি এবং তাঁহার দেহান্তরপ্রাপ্তিও অনাদি।

বদ্ধ ও মুক্তজীব

পূর্ণ—তাহা হইলে, সকল জীবই কি এইরূপ অনাদি-কাল হইতে দেহ পাইতেছেন?

আগন্তুক—না। সকল জীব নহে। জীব দুইপ্রকার। যে সকল জীব কখনও কামনা করেন নাই, তাঁহারা কখনও

এই জড় দেহ পান নাই, তাঁহারা 'নিত্যমুক্ত' অর্থাৎ নিত্যকাল ভগবানের ধামে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। আর যে সকল জীব, তাহা করিলেন না, তাঁহারা 'নিত্যবদ্ধ', অর্থাৎ নিত্যকালই দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছেন।

পূর্ণ—আমরা ত নিত্যবদ্ধ। তবে কি আমরা নিত্যকালই এইরূপ জন্মমৃত্যুর মধ্যে থাকিব? আমরা কি আর কখনও ভগবানের সেবা করিব না?

আগন্তুক—হাঁ, করিবেন বই কি? এই দেহ থাকিতেই পারিবেন। কামের আবরণ যে জীবের যতটা কমিয়া আসিয়াছে, তিনিই ততটা সেবা করেন। যাঁহাদের আবরণ 'অতি গাঢ়' (জরায়ুতে আচ্ছাদিত ভ্রূণের ন্যায়), তাঁহাদের অনেক বিলম্ব; যাঁহাদের উপরে 'গাঢ়' আবরণ (আদর্শে ময়লার আবরণের ন্যায়) তাঁহাদের শীঘ্রই হইবে; আর যাঁহাদের আবরণ 'গাঢ় নহে' (ধূমে আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়), তাঁহাদের সেবা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার যে পরিমাণে বাসনা কমে, সে সেই পরিমাণে ভগবানের সেবা করে। বাসনা কমিতে আরম্ভ না করিলে ভগবানের সেবা করা যায় না।

সংসার

পূর্ণ—সংসারে থাকিলেই ত বাসনা থাকিবে ? তবে কি সংসারে থাকিয়া ভগবানের সেবা করা যাইবে না ?

আগন্তুক—হাঁ। সংসারে থাকিলেই, বাসনা থাকিবে এমত নহে। সংসারে তুইরকম লোক বাস করেন। এক রকম লোক সংসারটাকে ভোগই করিতে চায় ; ভাল খাইব, ভাল পরিব, সম্পত্তি বাড়াইব, নিজের ভোগ বৃদ্ধি করিব ইত্যাদি বুদ্ধি করেন। ইঁহারা ভগবানের সেবা করিতে পারেন না। আর একপ্রকার লোক আছেন, তাঁহারা বিষয়ের সঙ্গে থাকেন বটে, বিষয়ীর ন্যায় সমস্ত কার্য্যই করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজের ভোগের জন্য করেন না। তাঁহারা, কায়মনোবাক্যে যাহা কিছু করেন, সমস্তই ভগবানের জন্য করেন। সুতরাং বাহিরে দেখিতে তুইরকম লোকের কার্য্যই একপ্রকার। কিন্তু বুদ্ধির তারতম্যে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কার্য্য শুধু কর্ম্ম, তাহার জন্য তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করিয়া ফল ভোগ করিবেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের কার্য্যসমূহই ভক্তি বা সেবা, তাঁহারা এইরূপ করিতে করিতে দেহ থাকিতেই সমস্ত জড়ীয় অভিমান ত্যাগ করিয়া মুক্ত হন। তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। দেহান্তর প্রাপ্তির অবসান হয়।

মুক্তির উপায়

পূর্ণ—এই সব কথা সংসারী কর্ম্মী লোকেরা জানিবেন কি করিয়া এবং তাঁহাদের গতি কি ?

আগন্তুক—সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে ।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় ।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয় ।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্ম্মুখ ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে ।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে ॥
কাম ক্রোধের দাস হইয়া তার লাথি খায় ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশমন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায় ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণের নিকট যায় ॥
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল ।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

পূর্ণ—তবে আমাদের কি করিতে হইবে ?

আগন্তুক—চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী কভু সুখী কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে নরকে বা কভু।
কভু দেব কভু দৈত্য কভু দাস প্রভু॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোনজন।
সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন॥
নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে, ওহে কৃষ্ণ ! আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥

কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

সাধুসঙ্গ

পূর্ণ—তাহা হইলে 'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম'ই আমাদের করিতে হইবে। এক্ষণে 'সাধু', 'সঙ্গ', 'কৃষ্ণ' ও 'নাম' এই চারিটী বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলুন।

আগন্তুক—সাধুর অপর নাম 'সৎ' অর্থাৎ যিনি নিত্যকাল একই অবস্থায় আছেন এবং যিনি 'সৎ' ছাড়া 'অসৎ' বস্তুতে আসক্ত হন না তিনিই সাধু, সুতরাং ভগবান্ এবং তাঁহার অংশ জীবই সাধু বা সৎ। যে সকল জীব বিরূপ-অবস্থাপ্রাপ্ত, তাঁহারা স্বরূপতঃ ভক্ত হইলেও সেই ভক্তির প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়া তাঁহাদিগকে অভক্ত বা অসাধু বলা হয়। আর আমরা বদ্ধ অবস্থায় ভগবান্‌কে

পাই না, এজন্য ভক্তের সহিত একত্র বাস করিয়া তাঁহার নিকট ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি শ্রবণ এবং ভক্তি শিক্ষা করিতে হইবে। একজন অপর একজনের নিকট বসিলে কিংবা কথা বলিলেই তাহাকে 'সঙ্গ' বলে না। একজন যখন অপরকে কিছু দান করে, গোপনীয় কথা বলে, ভোজন করায় এবং অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করে, গোপনীয় কথা শুনে, ভোজন করে—পরস্পরে এই ছয়প্রকার ক্রিয়া হইলে, তাহাকে সঙ্গ বলে। সাধুর সঙ্গে এই ছয়প্রকার ক্রিয়া করিতে হইবে। ইহার নাম সাধু সঙ্গ। সাধুর আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে নতুবা সাধুর নিকট খুব ভাল ভাল কথা শুনিয়া আসিলাম, আর সাধুকে খুব দণ্ডবৎ করিলাম, তাহাতে জীবের বিশেষ সুবিধা হইবে না।

কৃষ্ণতত্ত্ব

স্বয়ং ভগবান্ই কৃষ্ণ! ভগবান্ এতই শক্তিশালী, এমনই দয়ালু এবং তাঁহার এতই মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য যে, তিনি সকল জীবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। এজন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণ একই জিনিষ। যেহেতু তিনি নিত্য, তাঁহার নামও নিত্য।

আমরা আমাদের নাম হইতে পৃথক্। আমাদের নিত্য নূতন নাম হইতেছে এবং আমরা কোন নাম লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। বিশেষতঃ নামের যে অর্থ, তাহাও আমরা নহি। ভগবানের নাম সেরূপ নহে। ভগবান্‌ই নাম—ভগবান্‌ই নামী। এই সকল তত্ত্ব সাধুর নিকট হইতে জানিতে হয়। ইহা উপলব্ধির জিনিষ। শুধু গল্পের বিষয় নহে। আমরা কৃষ্ণকে আমাদের মনগড়া একটা কিছু মনে করি—সেদিন বৃন্দাবনে গোয়ালার ঘরে কৃষ্ণ জন্মিলেন, কিছু মাখন চুরি করিয়া খাইলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া দিন কাটাইলেন—বাঁশী বাজাইয়া বনে বনে গরু চরাইলেন—পরে মরিয়া গেলেন। এইরূপ ধারণা করিয়া আমরা আত্মবঞ্চনা করিতেছি। আমরা নিজের জড়বুদ্ধি বা জড় মন দ্বারা কৃষ্ণকে বুঝিতে বা জানিতে পারি না, যেহেতু তিনি জড়ের অতীত সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর" যিনি সাধু বা ভক্ত তিনিই কৃষ্ণকে জানেন। এই কৃষ্ণ-ভক্তের অপর এক নাম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বলিলে আমরা তিলকছাপ-দেওয়া মালা-পরা একটা দেহকে বৈষ্ণব মনে করি। বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বরূপে বৈষ্ণব। যেহেতু

জীবাত্মার বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সেবা বা ভক্তি ছাড়া আর অন্য কোন কার্য্য নাই। সুতরাং প্রত্যেক জীবাত্মাই বৈষ্ণব। বাহিরের দেহটাকে জীবগণ 'আমি' মনে করিয়া দেশ, কাল, জন্ম, বিদ্যা, ইত্যাদির সহিত এই দেহটাকে সম্বন্ধ করিয়া নিজকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পুরুষ, স্ত্রী, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ ইত্যাদি অভিমান করে। কিন্তু জীবাত্মার এইরূপ কোন মিথ্যা অভিমান নাই। সকল জীবাত্মাই এক। দেহটাকে আমি বুদ্ধি করিয়া একে অন্যকে পৃথক্ ও ভোগের সামগ্রী মনে করিয়া বিবিধ ক্লেশ ভোগ এবং ভেদবুদ্ধি করিতেছে। প্রত্যেক জীবের মন বিভিন্ন, এই মনের দ্বারা যখন বিচার করা যায়, তখন সকল বিষয়েই ভেদ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মবিষয়েও ভেদ আসিয়া পড়ে। কিন্তু যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যত্ববিচারে অগ্রসর হওয়া যায়, তখন ভেদ থাকিতে পারে না। তখন প্রত্যেক জীব দেখিবেন, তাঁহার অনাত্মীয় কেহ নাই, তাঁহার শত্রু কেহ নাই। তাঁহার ভোগের কিছুই নাই। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর সকল জীবই তাঁহার ভোগ্য। এই সকল তত্ত্ব সাধুর নিকট শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ সাধুর কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাহা গ্রহণ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া শ্রবণ করিতে হয়।

দ্বাদশ দর্শন

সবই ভুল ?

আগন্তুককে পরিপ্রশ্ন করিয়া পূর্ণ ভাবিতে লাগিল, তবে কি সবই ভুলে পরিণত হইল ! গন্তব্য স্থানে যাইবার উদ্দেশ্য ভ্রমপথে দীর্ঘকাল বহুদূর গত ব্যক্তির ন্যায় পূর্ণ দেখিল, সে এই সুদীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরকাল যাহা পাইবার জন্য যে পথে হাঁটিয়াছে, তাহা সেই দিকে নাই এবং সে পথে নয়। একে একে ভুলগুলি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগল। সে দেখিল, সে জীবন ভরিয়া শুধু গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়াছে। যখনই যেটিকে গ্রহণ করিয়াছে, তখনই সেটীকে নিত্য ও সুখময় বলিয়া বরণ করিয়াছে। যেগুলিকে আপন মনে করিয়া তাহাতে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, সেগুলি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে ! ইন্দ্রিয়গুলি তাহাকে সপত্নীর ন্যায় নানা বিষয়ে টানিয়া লইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে লইয়া চলিতেছে। কিন্তু কেহই তাহাকে তৃপ্তি প্রদান করিল না কিংবা একমুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে অবসর দিল না ; মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় সে জলের জন্য ধাবিত হইয়া, শুধু বালুকাই পাইল। ইন্দ্রিয়গুলির

সেবা ত কম করিলাম না। কিন্তু কৈ একটুও ত কমিল না। সেগুলি যেন প্রতিনিয়ত নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। স্ত্রীকে কতবার দেখিলাম, পুত্রকে কত 'বাবা' ডাকিলাম, কই সেই দেখার, সেই ডাকার ত আর শেষ পাইলাম না! ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় এই ভোগের ত শেষ পাই না। উপভোগের দ্বারা কাম কখনও শান্ত হয় না—জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা কখনও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না—বরং অধিকতর বেগে জ্বলিয়া উঠে। রাজা যযাতি হাজার বৎসর ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া স্বীয় জরা যুবক পুত্রকে প্রদান করিয়া পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়া ভোগ করিয়া দেখিল, ভোগের শেষ নাই, তখন তিনি সত্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভোগের দ্বারা ভোগ নিবৃত্তি লাভ করে না।

ভোগের আবাসভূমি মন। মনের উপাদানই ভোগ বা বাসনা। সুতরাং এই বাসনাময় মন দ্বারা বিচার করিয়া কেহ ভোগের হাত হইতে অবসর পায় নাই এবং কখনও পাইবে না। সুখ দুঃখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। একটা জিনিষেরই মাত্রার তারতম্যে সুখ দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এবং এই বোধ মনের। সুতরাং সুখদুঃখবোধ মনের নিত্যবৃত্তি। আমরা মনের

অধীন থাকিয়া মনের বিচারে চলিয়া সুখদুঃখের বিচার করিয়া দুঃখ দূর করিয়া সুখ পাইতে চাই। ইহার তুল্য ভ্রম আর কি হইতে পারে? সুতরাং মনের বিচার ফেলিয়া দিয়া আমাদের স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার বিচারে চলিতে হইবে। আত্মার সুখদুঃখ, ভালমন্দ ইত্যাদি বোধ বা বিচার নাই, সুতরাং যাহাতে আত্মার উপলব্ধি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। আর মনের বিচারে চলিব না! এমন সময়ে আগন্তুক আসিয়া গান ধরিলেন—

"ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা যে সংসারে আছে ভরা
তাহে কিবা আছে বল সার॥
ধনজন পরিবার কেহ নহে কভু কার
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥
আয়ু অতি অল্পদিন ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।

সে সুখের তরে তবে কেন মায়াদাস হবে
হারাইবে পরমার্থ ধন।
ইতিহাস আলোচনে ভেবে দেখ নিজ মনে
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি কত দুরাচার
শেষে লভিল মরণ নিশ্চয়॥
মরণসময় তা'রা উপায় হইয়া হারা
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল॥
এমন বিষয়ে মন কেন থাক অচেতন
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশ।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় কর সবে ভবজয়
এ দাসের সেই ত ভরসা॥"

হাঁ

১৯২৩ সনের ১৯শে মার্চ, পূর্ণ আর সে পূর্ণ নাই। সে জীবনের প্রকাণ্ড ভুলটী ধরিয়া তাহা সংশোধনের পথ ধরিয়াছে। আজ সে ভাবিল, আর কেন? মান, অপমান, লজ্জা, ক্রোধ, এই সবে জলাঞ্জলি দেওয়াই ত আমার কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব সংস্কারে ও অভ্যাসে চিত্তের নানা

স্থানে এইগুলি লুকাইয়া রহিয়াছে। তখন পূর্ণ ভাবিল, না, এগুলিকে আর স্থান দিব না। এই বলিয়া ক্রোধ, লজ্জা, অভিমানের মাথায় পদাঘাত করিয়া সে আজ অভিমানিনী মাখনের নিকট চলিল। কয়েকজন বন্ধুও তাহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। এমন সময়ে পূর্ণের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক হেমবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হেমবাবুকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণচন্দ্র তাহার ভুল ভাঙ্গিতে চলিল। এবং অক্ষয়দাসের লেনের বাড়ীতে যাইয়া পূর্ণ পুত্রকন্যাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা চাহিল। উহারা বৃদ্ধ পিতার এতাদৃশ অমায়িক আচরণে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। মাখন রন্ধনশালায় ছিল। হেমবাবু প্রথমেই রন্ধনশালায় মাখনের নিকট যাইয়া তাঁহার স্বভাবজ ওকালতি করিতেছিলেন, পূর্ণ পুত্রকন্যাকে লইয়া মাখনের নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল "মাখন, তোমরা বেশ অভিমান করিয়া আছ। থাক। কিন্তু আমি সমস্ত অভিমান, সমস্ত ক্রোধ দূরে ফেলিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি। আর ক'দিন বা বাঁচিব! মানুষের ভ্রমপ্রমাদ হইয়াই থাকে। তোমরা ভ্রম করিয়াছ কিনা তোমরাই জান। যদি আমার পক্ষে কোন ভ্রম হইয়া থাকে, আমি তজ্জন্য তোমাদের সকলের নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা সকলে মনের ময়লা ধুইয়া ফেল। এখন নূতন বাসা ঠিক কর। সেখানে আমরা সকলে একত্র বাস করিব।"

স্ত্রীজাতির কপালটা নাকি প্রায়ই পোড়া থাকে এবং চক্ষের জলটা বিনা আয়াসেই আসিয়া দেখা দেয়। রান্নাঘরে থাকায় ভিজা কাঠের ধূঁয়া তাহাতে একটু সহায় হইল। সুতরাং মাখন তখন দরদরধারে অশ্রুপাত করিয়া স্বীয় নিরপরাধ ব্যবহারের নিদর্শন দেখাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গদ্‌গদস্বরে সেই পোড়া কপালের আক্ষেপোক্তি করিতে করিতে বলিতে লাগিল "আমার কপালই মন্দ! আমি কি অপরাধ করিয়াছি জানি না।" পূর্ণ উত্তরে বলিল "আর কান্নাকাটি কেন? আমি ত সব কথা ভুলিয়া আবার আসিয়া আমারই অপরাধ জানাইয়া ক্ষমা চাহিলাম। সব কথা ভুলিয়া যাও। আজই আমার নবাবপুরের বাসায় চল কিংবা একটা নূতন বাসা কর, আমি সেখানে যাই।"

চক্ষের জল আসেও সহজে, আবার যায়ও সহজে। পূর্ণের কথায় মাখন সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিল "ব্যবহার ত একটুও বদলায় নাই। সবই ত সেই রকম দেখিতেছি। কেন, যদি সকল কথাই ভুলা হইল, তবে আর এ বাসায়

দোষ করিল কি? সব জায়গায়ই ত টাকা দিয়া থাকিতে হইবে! আমি এ বাড়ী ছাড়িব না। আমি অন্য কোথাও যাইব না।"

পূর্ণ উত্তরে বলিল "এই বাড়ীতে আমি অনেক কষ্ট ও লাঞ্ছনা পাইয়াছি। এখানে থাকিলে আমার আবার সেগুলি মনে পড়িবে। বিশেষতঃ আমার জিনিষপত্রগুলি এখান হইতে লইয়া গিয়াছি। এই বাড়ীতে তোমরা আমার সহিত যে দুষ্টব্যবহার করিয়াছ, তাহার ফলে আমি এই বাড়ী ছাড়িয়াছি, তাহা সকলেই জানে। সুতরাং এ বাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে যাই।"

মাখন পূর্ণের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। কেন, তাহা সেই জানে। তাহার ভ্রাতা সুরেশ গুপ্তের নামে এই বাড়ী ভাড়া আছে। এই ব্যাপারে ইহার সহিত কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে কিনা, তাহা মাখনই জানে। হেম বাবু অনেক অনুনয়বিনয় করিল, অনেক বুঝাইল, মাখন গলিল না! একে আগুনের তাপ, তাহাতে আবার চিত্তের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তদুপরি হেম বাবুর ঘর্ষণ —কিন্তু মাখন গলিল না!

পূর্ণ তাহার ভুল ভাঙ্গিতে গিয়া দেখিল, ঠিক, ঠিক, সবই ভুল—এ ভুল অঙ্ক মুছিয়া ফেলাই ঠিক! এই স্থির

করিয়া সে চির তরে মাখনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উর্ব্বশীর মোহে সন্তাপপ্রাপ্ত ঐলরাজের এই উক্তি স্মরণ করিতে করিতে চলিয়া গেল—

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ।
বিণ্মূত্রপূরে রমতাং ক্রিমীণাং কিয়দন্তরম্॥
পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্য্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যে নাবসীয়তে॥

চামড়া, মাংস, রক্ত, শিরা মেদ, মজ্জা, অস্থিসমূহ এবং বিষ্ঠা মূত্রের আধারমাত্র এই শরীরের জন্য যে ব্যক্তি মত্ত হয়, ক্রিমির সহিত তাহার কি প্রভেদ আছে? এই দেহটী সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র মাত্র, ভার্য্যার ভোগদাতামাত্র, অগ্নির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে আহুতি মাত্র কুকুর ও গৃধ্র পক্ষীর ভক্ষ্যমাত্র, বন্ধুগণের উপকর্ত্তা মাত্র। সুতরাং আজ হইতে আর কোন দেহের সঙ্গ পাইবার জন্য লালায়িত হইব না।

ভবি ভুলিবার নহে !

পূর্ণ তাহার মাখন ও মাখনোদ্ভূত লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতিকে বিস্মৃতির অতলজলে বিসর্জ্জন দিয়া দশহরা স্নান করিয়া আসিয়াছে। আগন্তুকও তাহার শূন্যীকৃত হৃদয়মণ্ডপে বৈরাগ্যের ঘট বসাইয়া রাখিয়াছেন। এইভাবে দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। হঠাৎ ৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণে চোকা ও ভেকা পূর্ণের নিকট উপস্থিত হইল। বিসর্জ্জিত প্রতিমার পুনরভ্যুদয়ে কে না বিস্মিত হয় ? পূর্ণও একটু বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন, বাবা, সেদিন তোমাদের নিকট আমি পিতা হইয়া ক্ষমা চাহিয়া আসিলাম, তোমরা তার পর একদিনও আসিলে না ! আচ্ছা, আমি ত পিতা, বৃদ্ধ। আমারই হার হউক। আমি কাল সকালে তোমাদের বাসায় যাইব।" পুত্রদ্বয় নিরুত্তর রহিল। কিছুক্ষণ পর তাহারা চলিয়া গেল।

পূর্ণ কতবার মাখনে আছাড় পড়িয়াছে। কতবার কাণমলা খাইয়াছে—আর সে পথে পা দিবে না। -আবার পা দিয়াছে। সেদিন নাকে খত দিয়া বলিয়াছে, আর না। পূর্ণ তখন এইরূপ কত সঙ্কল্প ও কত বিকল্পের কথা ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে গভীর নিদ্রায় রাত্রি অতি-

বাহিত করিয়া প্রাতঃকালে আবার মাখনের পিচ্ছিলতা ভুলিয়া মাখনত্ব প্রাপ্তির আশায় সাজসজ্জা করিতেছে, এমন সময়ে চোকা আসিয়া বলিল "তুমি যাইও না। গেলে চাকরবাকর কি মনে করিবে ?"

এক কাণ কাটা সহরের বাহির দিয়া যায়।
দু'কাণ কাটা সহরের ভিতর দিয়া যায়॥

পূর্ণচন্দ্র ! দেখ, তুমি কোন পথে যাও।

সমাপ্ত